বিশুদ্ধবাণী

দশম ভাগ

দিব্য-কথা

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
সম্পাদিত

বিশুদ্ধবাণী

দশম ভাগ

দিব্য-কথা

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
এম-এ, ডি-লিট্, পদ্মবিভূষণ, সর্বতন্ত্র সার্বভৌম
সম্পাদিত

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম
সি ২১/২, মালদহিয়া-বারাণসী-২

[মূল্য—তিন টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৮৯, ফীডর রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬
ফোন—৬১১ - ৫৭৩

প্রাপ্তিস্থান

১। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম
সি ২১/২, মালদহিয়া, বারাণসী—২

২। শ্রীশচীকান্ত রায়
৪৫—সি ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬

৩। শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৪, অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা—২৯

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

৫। "বিশুদ্ধাশ্রম"
গঙ্গাচরণ মিত্র রোড, বর্দ্ধমান

মুদ্রক—শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
কমলা প্রেস, গোধুলিয়া, বারাণসী।
ফোন—৬৪২৭৩

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৮৯, ফীডর রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬
ফোন—৬১১ - ৫৭৩

প্রাপ্তিস্থান

১। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম
সি ২১/২, মালদহিয়া, বারাণসী—২

২। শ্রীশচীকান্ত রায়
৪৫—সি ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬

৩। শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৪, অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা—২৯

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

৫। "বিশুদ্ধাশ্রম"
গঙ্গাচরণ মিত্র রোড, বর্দ্ধমান

Price (৭।৩।০)

মুদ্রক—শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
কমলা প্রেস, গোধুলিয়া, বারাণসী।
ফোন—৬৪২৭৩

—প্রস্তাবনা—

পরমারাধ্যপাদ যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের অমূল্য উপদেশাবলীর কিয়দংশ, তাঁহার জীবন-কাহিনীর কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া 'দিব্য-কথা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

তাঁহার কথায়—অন্তঃর্নিহিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য উপাদান সংগ্রহ বা মূল-শুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। উহার জন্য যোগ-মার্গ অবলম্বন অবশ্য করণীয়। 'কর্ম্মের' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"কর্ম্মেভ্যো নমঃ। 'কর্ম্ম' কর, 'কর্ম্ম' কর। দেহ থাকিলে কর্ম্ম করিতেই হইবে। সেইজন্য এমন কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যাহা দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়।"

শ্রীশ্রীবাবা 'কর্ম্মের'ই মাধ্যমে আমাদের 'জাগাইতে' চাহিয়াছেন। জাগরণই ত' জীবন! তবে মানুষ যে জীবনে জাগিয়া আছে তাহা ইন্দ্রিয়ের সুখ-সুপ্তি বা মৃত্যুরই সমতুল্য। সে তাহার স্বরূপের মহিমা সম্বন্ধে উদাসীন বা অচেতন।

২৯শে ফাল্গুন—১৩৭৬

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

—বর্ণানুক্রমিক সুচী—

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

3/274

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্রষ্টব্য :—

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ	হইতে উদ্ধৃত	অংশ চিহ্ন—	(ক)
যোগিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ	"	"	(খ)
বিশুদ্ধবাণী	"	"	(গ)
বিশুদ্ধ বাক্যামৃত	"	"	(ঘ)
জ্ঞানগঞ্জের ৮ খানি পত্র	"	"	(ঙ)
প্রকৃতি-তত্ত্ব	"	"	(চ)
গীত-রত্নাবলী	"	"	(ছ)
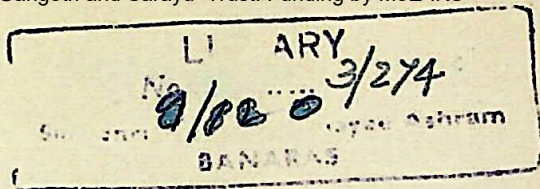
বিশুদ্ধবাণী

দশম ভাগ

মঙ্গলাচরণ

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ
পূজামূলং গুরোঃ পদম্
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং
মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা।

নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেব প্রতিমাতে যে পূজা করা হয় শ্রীশ্রীগুরুতেও তদ্বৎ জানিবে।

শ্রীশ্রীগুরুর চরণে সমস্ত দেবভাব অধিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রম্

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

দিব্য-পুরুষ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের

দিব্য-কথা

শ্রীসুবোধচন্দ্র রক্ষিত

অতৃপ্তি—জীব স্বভাব হইতে বিচ্যুত বলিয়াই তাহার এত দুঃখ। কিন্তু তাহার স্বভাবের সংস্কার তাহার মধ্যেই রহিয়াছে; এবং তাহাকে অবিরত আপনার দিকে, মায়াতীত রাজ্যের দিকে, টানিতেছে। এইজন্যই তাহার মধ্যে নিত্য একটা অতৃপ্তি, একটা অভাব বোধ, লাগিয়াই আছে। সে ধন চায়, কিন্তু ধন পাইলেও তাহার তৃপ্তি হয় না। জন (স্ত্রী পুত্রাদি) চায়, কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই; যশঃ চায়, তদ্দ্বারাও কামনার শেষ হয় না। শত্রু নিপাত চায়, তাহা ঘটিলেও সে স্বস্তি পায় না। সে মায়ের কাছে অনবরতই আবদার করিয়া বলিতে থাকে, "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" এমন কি, মায়ের কৃপা তাহার মধ্যে অনেকটা বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও সে ঐ কথা ছাড়ে না। তাহার চিত্তটা কিছু শুদ্ধ হওয়ায় সে 'রূপ' অর্থে বুঝে পরমবস্তু বা বিন্দু। 'জয়' অর্থে বুঝে শাস্ত্রজ্ঞান। "যশঃ" বলিতে বুঝে ব্যাপক দৃষ্টি বা ঐরূপ কিছু। 'দ্বিষো জহি' (শত্রুগণকে নিপাত কর) বলিতে বুঝে কামক্রোধাদি রিপুর জয়। তাহার জ্ঞানের ও শক্তির সংকীর্ণতা এবং আনন্দের খণ্ডতা বা অচিরস্থায়িতা তাহাকে ব্যথিত করে।

অভাব—যাকে যেমন অবস্থায় ফেলিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, তাহাকে ঠিক সেই অবস্থায় ফেলিতেছি। মনে রাখিও তোমাদের কল্যাণের জন্য যতখানি দেওয়া দরকার—তাহা আমি দিতেছি ও করিতেছি। * * * সাধন প্রভৃতি দ্বারা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে মানবের যাবতীয় অভাব মিটিয়া যাইবে।

আশ্রয়—গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। মাকে জাগাও—জাগাইয়া মায়ের কোলে উঠিয়া ব'স,—সকল অভাব মিটিয়া যাইবে।

আসন—ঠিক মন দিয়ে আসনে বস্‌তে হয়? আহ্নিক কর্‌ব এই রকম বুদ্ধি নিয়ে বস্‌লে মনকে স্থির হ'তেই হবে। কেবল একটা ছুতা ক'রে কিছুক্ষণ বসা, আর ঐ সময়ে দশ রকমের ভাবনা করলে হবে না। মন বেশ ক'রে বেঁধে ব'সতে হবে।

সঙ্কল্প ক'রে বসার পরেও মন যদি ছুটাছুটি করে, তা' হলেও মন্ত্র চালাবে। তোমরা কিছুক্ষণ চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে ব'সে দু'দশবার জপ করেই দেখতে থাক, বিভূতি টিভূতি কিছু হ'ল কিনা। ভগবান যে দোরের গোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তা' দেখতে পাও না। তিনি ঢুকবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তোমরা তাঁকে ডাক না।

আমি-ব্রহ্ম—'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার বোধকে ভ্রান্তি বলিতে পারা যায়; না বলিতেও পারা যায়। ব্যবহারিক ভাষায় সে অবস্থার বোধ প্রকাশিত হয় না। অগ্নিময় লৌহ

যদি নিজকে অগ্নি বলিয়া বোধ করে ও বলে 'আমি অগ্নি', তবে একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ, দহন করিবার সামর্থ্য ও অন্যান্য অগ্নি-ধর্ম্ম তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ, উহা মিথ্যাও বটে। কারণ, অগ্নি-সম্বন্ধ-চ্যুত হইলে, তাহার অগ্নিময়তা থাকে না। তখন সে যে লৌহ, সে লৌহই থাকিয়া যায়। সুতরাং, লৌহ যখন অগ্নিময় হয় তখনও সে বাস্তবিক অগ্নি হয় না। তবে, যদি অগ্নির সহিত লৌহের যোগ নিত্য অচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে লৌহের পক্ষে লৌহত্ব সত্ত্বেও, "আমি অগ্নি" এই প্রকার অনুভব সম্ভব। সেই প্রকার যিনি যোগী যাঁহার যোগ বা সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না, যিনি ব্রহ্মের সহিত সদা যুক্ত, তিনি, ব্রহ্ম না হইলেও নিয়ত-সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব বা বর্ণনা করিলে দোষের হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্ব-সত্তা নাই—তাহা নহে, তাঁহার স্ব-সত্তা ও তদ্বোধ হারায় না। "আমি ব্রহ্ম"—এই অনুভূতিটিকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে ইহাতেও দুইটি জিনিষ ও সম্বন্ধ আছে। এই 'আমি'টিই ত বিশুদ্ধ জীবরূপে 'আত্মা'—তাহার বোধ যদি না থাকে, তাহা হইলে "আমি ব্রহ্ম"—এই প্রকার অনুভব হইতেই পারে না।

শুদ্ধ ব্রহ্ম সত্তাতে 'আমিত্ব' নাই। আত্ম-ভাবকে আশ্রয় না করিয়া 'আমিত্ব' অনুভব জাগে না। যখন স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আধারে 'আমিত্ব' স্ফুরণ হয় তখন বন্ধন, আর যখন এই

সকল আধার ব্যতিরেকেও তাহার স্ফুরণ হয়,—তখন হয় মুক্তি।

মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মবোধ থাকে, ইহা ব্রহ্মাশ্রয়ে প্রকাশমান হয়। সুতরাং “আমি ব্রহ্ম”—এই অনুভব একেবারে মিথ্যাও নহে। ইহাই পরমানন্দ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা যোগ অবস্থা। এই অবস্থায় “আমি” বোধ বা আত্মবোধ লুপ্ত না হইয়া ব্যাপকতা লাভ করে। ব্রহ্ম যেমন ব্যাপক, ব্রহ্মের সহিত যোগ-প্রাপ্ত ‘আমি’ও তেমনই ব্যাপক হইয়া পড়ে। * * *

আনন্দ -আনন্দ চারি প্রকার আছে; সব আনন্দই ব্রহ্মানন্দ নয়। আমরা যে আনন্দের সহিত পরিচিত সেটা চিত্তবৃত্তি মাত্র। ব্রহ্মানন্দ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু। চিত্তরোধ করিলে সেটীর আস্বাদন পাওয়া যায়।

আত্মা—আত্মা একটা নয়। আত্মা, পরমাত্মা ও মহাত্মা। মহাত্মাই মহাশক্তি। তাহা হইতে পরমাত্মার বিকাশ। মহাশক্তিতে মনের ক্রিয়া চলে না।

ইষ্টদেবতা—ইষ্টদেবতার যে পরমাণু, মন্ত্রজপের বলে সাধকের দেহেও, সেই পরমাণুর সৃষ্টি হয়। ইষ্টদেবতা দেখিলে অষ্টভুজ, পঞ্চমুখ ইত্যাদি মুর্ত্তি দেখা যায়, দেখিলে ভয় হয় না। ভয় ব্যাপাবটা কি? বিভিন্ন রকমের পরমাণুর সংঘর্ষ হইলেই একটা অস্বস্তি বোধ হয়, তাহাই প্রবল হইলে, তাহাকে বলে ভয়। একটা নূতন স্থানে গেলে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে,

হয়ত ঘুম হয় না। পরমাণুর বৈষম্যই উহার কারণ। দেবতার পরমাণু সাধকের শরীরে, সাধন দ্বারা উৎপন্ন হয়। সাম্য না হইলে দর্শনাদি হয় না। * * আমি যদি কাহাকেও কোনও দেবমূর্ত্তি দেখাই, তখন আমি সেই রকমের পরমাণু তথায় আকর্ষণ করি। দর্শকের মধ্যে সেই সকল পরমাণুর সমাবেশ হয়। নিজের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন নয় বলিয়া সেই সকল পরমাণু বেশীক্ষণ থাকে না।

ঐশ্বর্য্য—জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইয়া পারে না। ঈশ্বর ভাবই ঐশ্বর্য্য—তাহা আত্মার স্বরূপ হইতে পৃথক্ জিনিষ নহে। জ্ঞানের উদয়ে যখন আত্মার আবরণ তিরোহিত হয়, তখন আত্মার স্বভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবেই—ফুল ফুটিলেই তাহাতে মকরন্দের বিকাশ হইবে,—ইহাই অর্জ্জন। ইহার পর ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন বা নিবেদন। ইহাই ত্যাগ। ইহার ফল পরমাত্ম ভাবে প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব না জাগাইলে, পরমাত্মভাবে প্রবেশ লাভ হয় না। আত্মার স্বভাবকে জাগাইয়া, তবে নিরুদ্ধ করিতে হয়। এই নিরোধের পূর্ণতা হইতে অমৃত লাভ ঘটে। আত্মার স্বভাবকে জাগান, আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ সমান কথা। সুতরাং কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া পরে তাহাকে অনন্ত মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হয়—পরমশিবের পদে বিলীন বা মুক্ত করিতে হয়—তাহাই জীবের অমৃত লাভের উপায়। পরম শিব ও মুক্ত কুণ্ডলিনী বা পরাশক্তির মিলন হইতে নিত্য যে সুধা স্রাব হয়,

বা আনন্দ ক্ষরণ হয়, জীব-মুক্তজীব তাহাই ধ্যান করে, তাহাই পান করে—আস্বাদন করে।

উপাদান সংগ্রহ ও উপাদান শুদ্ধি—যদি আমাকে আত্ম-শোধন করিতে হয়, তবে আমাকে উপাদান শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমি কেবল চলাফেরা ও ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখি (তাহাও আবশ্যক) তাহা হইলে লোক দৃষ্টিতে সংযম লাভ হইলেও মূল শুদ্ধি হইবে না। কখনও না কখনও আকস্মিক বন্যার তীব্রবেগে সংযমের কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই উপাদান শুদ্ধির উপায় একমাত্র 'যোগ'। যাহাকে স্থূলদেহ বল, তাহা বাসনার সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যে প্রণালীতে স্থূলভাব কাটিয়া যায়, তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বাসনা ত্যাগের আর কোনও নূতন প্রণালী নাই। স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, আর তাহা প্রজ্জ্বলিত না হইলে স্থূলের ও নিবৃত্তি হয় না—এবং এই সংঘর্ষই যোগাত্মক কর্ম্ম। স্থূলের দাহ এবং বাসনার ক্ষয় অভিন্ন ব্যাপার—ইহা জ্ঞানোদয় বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের সমকালীন।

উপাদান সংগ্রহ না করিয়া শুধু 'ভাবনার' দ্বারা কোনও ফল লাভ হইতে পারে না। সত্ত্ব-শুদ্ধি পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের বিকাশ না করিতে পারিলে, সংকল্প কখনও সিদ্ধ হয় না। 'ভাবনাই' ত' কল্পনা। জীবভাবের কল্পনা দ্বারা ব্যবহারিক সত্ত্বার

অভিব্যক্তি হয় না। ঐশ্বরিক কল্পনা দ্বারা হইতে পারে। ঈশ্বরের কল্পনা সত্ত্য মুলক—তাই তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে পারেন। জীব ঐশ্বর্য্য লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহা পারে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ভূত-শুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি, ন্যাস—যাহাদের হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হয় না। অজ্ঞানীর ভাবনা ও জ্ঞানীর ভাবনায় অনেক ব্যবধান। সচরাচর উপাসনার বিষয়ে যে সকল আলোচনা হয়, তাহা অজ্ঞানীর উপাসনা। বস্তুতঃ ঐ সকল স্থানে ভাবনা, প্রাতিভাসিক সত্তার উর্দ্ধে অন্য কিছু প্রকটিত করিতে পারে না। জ্ঞানীর ভাবনাই প্রকৃত উপাসনা—তাহাতে ব্যাবহারিক সত্ত্বা পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়।

উপলব্ধি—কর্ম্মের দ্বারা বিত্তার বিকাশ হইলে আসল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উপলব্ধি চাই, নচেৎ ভগবানের কাছে থাকিলেও কিছু লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ কৃপাবশে অর্জ্জুনকে কাছে রাখিয়া ছিলেন।

কর্ত্তব্য (সাংসারিক)—তোমরা, বাপু, ছেলেদের জন্য এত ভাব কেন? তোমরা যখন ঐ রকম কথা বল তখন তোমাদের উপর আমার ঘৃণা হয়। এই তুমি যে টাকা রোজগার করেছ, সে কি তুমি নিজের ভাগ্য বলে কর নি? তেমনি ছেলেরাও ত যার যার অদৃষ্ট নিয়ে এসেছে। তাদের অদৃষ্ট তুমি কি করে বদলে দেবে? তোমরা যা কর্ত্তব্য ক'রে যাও, বাস্ ঐ পর্য্যন্ত। তারপর, তাদের অদৃষ্টে যা আছে তা'ই হবে। কর্ত্তব্য মানে—ছেলেদিগকে সুশিক্ষা দিবে; তারা যাতে

কু-পথে না যায় তা' দেখবে। তারপর রোজগার ইত্যাদি তাদের অদৃষ্ট অনুসারে তারা ক'রবে !

কার্য্য কি প্রকারে হয়—আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বলি, তাহা সব অবস্থায় থাকে না, থাকিতে পারে না। কারণ লিঙ্গের ক্রিয়া ভিন্ন কোন বৃত্তির উদয় হইতে পারে না। লিঙ্গ যখন বাসনা ও সংস্কার রহিত স্থূল সম্বন্ধহীন, তখন উহাতে ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধ পরমাত্ম ভূমিতে লিঙ্গ অভিভূত, তাই নড়িতে পারে না। অতএব কৈবল্যে জ্ঞান বা ইচ্ছার সম্ভাব কল্পনীয় নহে। তবে শুদ্ধ বাসনা বা শুদ্ধ সত্ত্ব অবলম্বনে তাহাতে জ্ঞানাদির উদয় হইতে পারে। চিত্তের বৃত্তি লিঙ্গের ক্রিয়ামূলক। সুতরাং লিঙ্গ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন যে চিত্ত বৃত্তিহীন তাহা বলাই বাহুল্য। * * * স্থূল জড়, লিঙ্গ যেমন তাকে চালায়, সে তেমনিই চলে। কিন্তু বাস্তবিক সঞ্চালন-শক্তি লিঙ্গেতে নাই। তাহা আত্মায় আছে। আত্মার সঞ্চালন শক্তি লিঙ্গকে চালিত করে, লিঙ্গ চালিত হইয়া স্থূলকে চালিত করে। সেইজন্য লিঙ্গ আত্মায় যুক্ত হইলে স্থূলদেহ নিশ্চল হইয়া যায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা ইহজন্মের কার্য্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মও নিজেরই কর্ম্ম ত' ? কর্ম্ম ভিন্ন ফল নাই। যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে তেমন ফল পাইবে। সেইজন্য বলা হয়—"কর্ম্মভ্যো নমঃ।" কর্ম্ম

করিতে করিতে (গুরুদত্ত সাধন) চিত্তের মল কাটিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরিপক্কতায় ভক্তি সঞ্জাত হয়। ভক্তি মধ্যে গোড়ার দিকে একটা উচ্ছ্বাস বা মাদকতা থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রশম হয়। তখন ভক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে।

কর্ম্ম সংঘর্ষ স্বরূপ। কিসের সহিত কিসের সংঘর্ষ ?— মনের সহিত মন্ত্রের, মন অধর অরণি, মন্ত্র উত্তর অরণি (যজ্ঞ কাষ্ঠ)। যেমন অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া অরণিকেই ধ্বংস করে, সেইরূপ মন ও মন্ত্রের সংঘর্ষে যে তেজ উৎপন্ন হয়, উহা মনের অশুদ্ধি ও মনের বর্ণাত্মক আবরণ উভয়ই নষ্ট করিয়া দেয়। তখন মন হয় শুদ্ধ সত্ত্ব, এবং মন্ত্র হয় চৈতন্যময়ী শক্তি। এই সময়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তারপরও যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে, তাহার ফলে জ্ঞান ভক্তিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিশুদ্ধিই ভক্তি। ভক্তির নির্ম্মলতা প্রেম। জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত ভক্তি হয় না। জ্ঞানে আস্বাদন নাই, ভক্তিতে উহা আছে এবং উহাই জ্ঞান হইতে ভক্তির বিশেষত্ব।

শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা শুষ্ক জ্ঞান, তন্মাত্র দ্বারা পাণ্ডিত্য খ্যাতি ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত না হইলে ভক্তি হয় অন্ধা বা উন্মাদিনী। যোগীর কর্ম্মের অন্ত নাই।

কীর্ত্তন—কীর্ত্তনে বিরহ ইত্যাদির গান শুনিয়া যে চক্ষে জল

আসে তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় বিশেষ নাই। নিজের যে বিরহ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা আছে, উহা রাধা ইত্যাদিতে আরোপ করিয়া তাহার উপভোগ হয় মাত্র। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাধার আবার বিরহ কি? শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে রাধা তাঁহার সহিত নিত্যযুক্তা। কীর্ত্তনের সময় যে ভাবে লোকে কাঁদে, তাহা পদকর্ত্তাদের মনের সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতায় প্রকৃত লাভ বা উপকার কিছুই হয় না, বরং মন দুর্ব্বল হয়।

ক্রিয়া—যথাসময়ে "ক্রিয়া" করিলে অল্প সময়ে যে ফল হয়, অন্য সময়ে ততখানি ফল পাইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় ও শ্রম লাগে। * আহ্নিক করিবার সময় জপ চলিতে থাকিলেও, মন সব সময় তাহাতে সংযুক্ত থাকে না, সেরূপ জপেও ফল হয়। আসনে বসিয়া জপ করিলে তাহার ফল অবশ্য হইবে। অতি অল্প সংযোগ থাকিলেও সেইটুকু ধরিয়াই জগদম্বা সাধককে উঠান।

"ক্রিয়া" কর, "ক্রিয়া" কর, তাহাতেই নির্ভর আসিবে, সকল বুঝিতে পারিবে, আর বিচলিত হইবে না। "ক্রিয়া" করিলে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। কৃপা ত' অনবরতই মাথার উপর ঝরিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ কি? স্ত্রীর পিছনে, অর্থের পিছনে, ভাল খাদ্যের পিছনে ছুটিতেছ—তখন তোমরা কর্ত্তা, কেবল সাধন-ভজনের বেলায়—'বাবা' কৃপা

করুন। তোমাদের কাছে আমি শুধু এই চাই—তোমাদের সুমতি হোক, তোমরা সদ্বৃত্তি পোষণ কর।

সকল কার্য্যেরই সময় আছে। অসময়ে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। চারিটি সন্ধিক্ষণ আছে—সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, মধ্যাহ্ন ও মহানিশা। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে যে বস্তু আসে, তাহা অধিক সূক্ষ্মতর।

কৃপা—কৃপা চেষ্টানুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপা হইলে এক মুহূর্ত্তে সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ভাবটি পাওয়া যায়, আবার তাঁহার কৃপা না হইলে ত্'ঘণ্টাতেও হয় না। মানুষ কর্ম্ম করিবে—কর্ম্মেই তার অধিকার। ফলদান ঈশ্বরের আয়ত্ত। তাহাতে কর্ম্মীর কোনও হাত নাই, কোনও জোর নাই, দাবী-দাওয়া নাই। তবে তিনি কৃপাময়। * * * নিজের চেষ্টা চাই। ঈশ্বরের কৃপা সকলের উপরই আছে। নিজে চেষ্টা করিয়া সেইটী উপলব্ধি করিতে হয়। চেষ্টা ভিন্ন অনুভবের মধ্যে উহা আসে না। একটু ঘা খাইলেই ভগবানের দিকে টান হয়। কৃপার জন্য চিন্তা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কর্ম্মের আশ্রয় করিলে যথাসময়ে বিকাশ হইবেই। অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও, সেই নিষ্ক্রিয় অগ্নির দ্বারা দাহ ও প্রকাশরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না; কিন্তু কার্য্যের সাধন করিতে হইলে অগ্নিকে জাগাইয়া লইতে হয়, সেই প্রকার কৃপা সম্বন্ধেও জানিবে। জীবের ঊর্দ্ধগতিও কৃপা ভিন্ন হয় না। ভগবান যে, জীবকে নিরন্তর নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন ইহাই তাঁহার কৃপা। এই আকর্ষণ শক্তির সাহায্য না পাইলে

বদ্ধ-জীবের এমন কোনও ক্ষমতা নাই যে, তাহা দ্বারা সে তাঁহার চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। সংঘর্ষণ ভিন্ন স্থূল-নাশের দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই বলিয়া সংঘর্ষণ হইতে কৃপার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ, স্থূলভাবের নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহাত্মবোধ, অর্থাৎ জড়তা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান বিলীন হইয়া যায়। যোগ-রূপ কর্ম্মই অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিবার প্রথম অবলম্বন। জড়কে ধরিয়াই জড়কে ছাড়াইয়া চৈতন্যে উপস্থিত হইতে হইবে। * * * * * আশ্রয় গ্রহণ, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি ভিন্ন কৃপার বিকাশ হয় না। আবার, কৃপা ব্যতিরেকে অভিমান ছাড়িয়া শরণাপন্ন হওয়াও যায় না। যদি কাহারও মনে মুক্তি-ইচ্ছা, শুভ-ইচ্ছা, ভাল হইবার ইচ্ছা জাগিয়া থাকে—জানিবে তাহাও ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন। যদি দেখিতে পাও, কাহারও উপর কৃপা হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই জানিও উহার পশ্চাতে অতি তীব্র পুরুষকার রহিয়াছে। কত জন্মের খাটুনি, কত হাহাকার ও ব্যাকুলতা, কত আর্ত্ত-বেদনা, কত নীরব অশ্রুপাত কাটিয়া গিয়াছে—এখন তাই কৃপার সঞ্চার হইয়াছে। হঠাৎ কোনও জিনিষ হয় না। একজন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কৃপা পাইল, আর একজন সমস্ত জীবন খাটিয়াও তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিল না—মনে করিও না, ইহার কোনও তাৎপর্য্য নাই। যে সমস্ত জীবন খাটিয়াও কৃপা পাইল না,—জানিও তাহাকে আরও খাটিতে হইবে। ফাঁকি দেওয়ার উপায় নাই।

কাম-ক্রোধাদি রিপু —কাম-ক্রোধাদির যোগে মন বড় চঞ্চল হয়। এই গুলি উপশমের উপায় হইতেছে 'যোগ'। 'যোগ' দ্বারা ঐ গুলির দমন হয়। তবে, রিপুগুলি একটু শান্ত না হইলে ঠিকমত 'যোগ' হয় না। কিন্তু ও গুলিরও প্রয়োজন আছে। তুষ ফেলিয়া ধান বুনিলে কি গাছ হয়? তুষ খারাপ জিনিষ বটে, কিন্তু উহারও কার্য্যকারিতা আছে। কাম, ক্রোধ এইগুলি খারাপ ও হেয়—এই বোধ জাগিলেই ত' অনেকটা হইয়াছে বলিতে হইবে। "ক্রিয়া" করিতে করিতে চিত্তের বিক্ষেপ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। * * দম্ভ, অহংকার—এ সব বড় খারাপ বৃত্তি। এ সব আশ্রয় করিলে কখনই শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। যেখানে অর্থ সেখানেই দম্ভ। লোভ সম্বরণ একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রোধ দমনও কর্ত্তব্য; কাম হইতেও ক্রোধ অধিক অনিষ্টকর। * * পত্নী-বিয়োগের পর চরিত্র-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে। দ্বিতীয় বার বিবাহ করাই ভাল। ভারি আপদ হইতে রক্ষা করে বলিয়া, স্ত্রীকে বলা হয় ভার্য্যা। কামুকতা মহা আপদ। বিবাহিতা পত্নীর সহবাসে ধর্ম্ম হানি হয় না। * * *

কাম-ক্রোধাদি রিপু মনুষ্যের অপকারী হয়—তাহাদের অপব্যবহার করিলে, উহাদের ব্যভিচার হইলে মনুষ্যের কষ্টের কারণ হয়—ধ্বংসের কারণ হয়। প্রয়োজন মত সৎভাবে উহাদের প্রয়োগ হইলে, উহাদের দ্বারা আমাদের বিশেষ হিত-সাধন হয়। ঐ সমস্ত যদি তাঁহার উপর প্রয়োগ হয়, উহারা কত আনন্দ দেয়। কামুকের ন্যায় ভগবানের দিকে ছুট,

তাঁহাকে আলিঙ্গণ কর, তাঁহার উপর রাগ কর, তাঁহার জন্য মুগ্ধ হও, তাঁহাতে মেতে থাক—তিনি তোমার আপন, আপনার জন, তুমি তাঁহার প্রিয়, তিনি তোমার উপর কৃপাবান—এই গরবে আকৃষ্ট হও—ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে। তা' ছাড়া দয়া আদি সদ্‌বৃত্তি যেমন আবশ্যক,—এই সব জিনিষও তেমনিই আবশ্যক। উভয়ের সংযোগ না হইলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। বাপু, ধান হইতে যদি তুষ ছাড়াইয়া লও, কেবল চাল হইতে অঙ্কুর হয় না—উভয়ই আবশ্যক। উভয়ের সংযোগ থাকিলে তবে তাহাতে অঙ্কুর হয়।

কর্ম্মযোগ—মানুষ যতদিন স্থূলদেহে অভিনিবিষ্ট থাকে, ততদিন তাহার কর্ত্তৃত্ব অভিমান বা অহংকার বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় তাহার কর্ম্মেই অধিকার। দেহ, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লও। স্থূলদেহে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্ম্ম না করিয়া নিস্তার নাই। কর্ম্ম করিব না বলিয়া বসিয়া থাকিতে গেলেও তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন এমন কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যাহাদ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। এই কৌশল যুক্ত কর্ম্মকেই 'যোগ' বলে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ 'যোগ' আশ্রয় করিতেই হইবে। * * কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতিকে ধরিতে চাও, তবে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির সন্ধানই পাইবে না। যাহা পাইবে, তাহা আভাস মাত্র,

তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। যে পন্থাই স্বীকার কর, তাহা শুধু বাহ্য চিহ্নমাত্র। সর্ব্বত্রই কর্ম্মের আসন প্রধান। জ্ঞান মার্গের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং ভক্তি পথের বিবিধ সাধন-ভক্তি কর্ম্মেরই অন্তর্গত। মোট কথা, স্থূল সম্বন্ধ বশতঃ মনুষ্য শুধু কর্ম্মেরই অধিকারী।

সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে 'কর্ম্ম' করিলে পরের অবস্থাগুলি আপনা আপনিই খুলিয়া যায়। কর্ম্মকে প্রধান বলিবার ইহাই একমাত্র কারণ। চিরকাল 'কর্ম্ম' করিতে হয় না। 'ক্রিয়া' করিতে করিতে 'ক্রিয়ার' যে একটি পরাবস্থা আছে, আপনিই স্ফুর্ত্তি হয়। যতক্ষণ সে অবস্থার বিকাশ না হয়, ততক্ষণ 'কর্ম্ম' অবশ্যই করিতে হইবে। 'কর্ম্ম'-ত্যাগ ইচ্ছা করিয়া হয় না—উহা যথাকালে আপনিই হইয়া যায়। * * * * * কর্ম্মের দ্বারা প্রাক্তন কাটান যায়, বিধির বিধান উল্টাইয়া দেওয়া যায়। মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস শুধু এক জীবনেই আবদ্ধ নহে। তুমি আজ যে অবস্থায় আছ, তাহা যেমন পূর্ব্বদিনের জ্ঞান ও কর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তোমার বর্ত্তমান জন্মও দেহও সেই প্রকার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের ফলস্বরূপ কর্ম্ম সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সংস্কার স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। একটি বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং ঐ বীজ বিশ্লেষণ করিলেই ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সমগ্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়, সেই প্রকার গর্ভাধানকালে পিতার বীর্য্য ও মাতার রজঃ সংযুক্ত হইয়া যে

বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ দেহের বিকাশ হয়— ঐ দেহের ইতিহাস ঐ বীজকে বিশ্লেষণ করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। তন্ত্র শাস্ত্রে যে নাদ, বিন্দু ও বীজের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপতঃ এই পিতৃভাব, মাতৃভাব ও উভয়ের সংঘটন জনিত সন্তান-ভাবের ব্যাপার মাত্র।

কর্ম্ম ফল কখনই নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সাধন-সংস্কারকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে বর্ত্তমান জন্মে উহার অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। নতুবা উহা বিনষ্ট না হইলেও নিষ্ক্রিয় ভাবে চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। কর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ না হইলে কেহ সিদ্ধিলাভ বা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। * * সকল স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে দেখিবে। স্ত্রীলোক দেখিলে মনে করিবে—'ইনি আমার মা'। দুর্জ্জয় রিপু, তাহার সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হয়।

সাধারণ কর্ম্ম-জীবন ও সাধন-জীবন—সাধন-জীবন আর সাধারণ কর্ম্ম-জীবনের জীবন-ধারার সহিত সামঞ্জস্য ধীরে ধীরে আপনিই হইয়া যাইবে, যদি 'ক্রিয়ার' সময় ঠিক মত কাজ কর। 'ক্রিয়ার' সময়টুকুতে ভাল করিয়া 'ক্রিয়া' করিতে হইবে। ভাল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইতে হইলে সেই বিষয়ে তীব্র ভাবে আলোচনা বা চিন্তা করা দরকার। খারাপ পরমাণুগুলি এখন তোমার মধ্যে খুব প্রবল আছে বলিয়া ভাল বিষয়ের পরমাণু আসিতে পারিতেছে না। তীব্র সংঘর্ষের দ্বারা

খারাপ পরমাণুগুলি পরাজিত হইবে। পূর্ব্বেকার সংস্কারগুলি এখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে তোমার মধ্যে রহিয়াছে। মনটাকে কখনও বিচলিত হইতে দিবে না। তোমরা কি ভাবে 'ক্রিয়া' কর, বা অন্য যে সকল কার্য্য কর, বা না কর—সবই আমি নিজে দেখি। ক্লান্ত হ'য়ে গেছি ব'লে আসনে পর্য্যন্ত না বসে, কোনও রকমে কাজটা নিয়ম রক্ষার মত সারাটাতেও, আমার খবর থাকে। * * * আমি শুধু দেখি, তোমাদের কতটা দৌড়। তাই আমি ছেড়ে রেখেছি। তবে, যখন অতিরিক্ত হ'তে থাকবে, তখনই তীব্র আঘাতের দ্বারা চৈতন্য সঞ্চার করে দেবো। এই কথা বেশ উপলব্ধি করবে এক সময়ে। * * * *

রেতঃপাত যত কম হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া ও কপটতা ত্যাগ করা প্রয়োজন। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সরল সত্য অবলম্বন করিবে। এ ছাড়া—আহার বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা এবং রাত্রিতে সামান্য আহারই ভাল। পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ করিবে। সর্ব্বদা চরিত্র বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। * *

গুরুর আবশ্যকতা—গুরুকরণ ভিন্ন যে ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয় না, ইহা সত্য কথা। বিশুদ্ধ আধারে প্রকাশমান চিৎশক্তির সহকারিতা না পাইলে, জড়ত্বের আবরণে আচ্ছন্ন জীব কি প্রকারে আবরণ কাটাইয়া নিজের চৈতন্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করিবে? যে শক্তি ঈশ্বরে আছে, তাহাই জীবে আছে—সত্য, কিন্তু ঈশ্বরে সে শক্তি প্রকট, কার্য্যকরণ সমর্থ—অভিব্যক্ত;

জীবে তাহা অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়; অপ্রকট, জড়ত্বের ভারে অবসাদ-গ্রস্ত। জীবশক্তিও যে চিৎশক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা অবিদ্যাগ্রস্ত। উহার বলাধান করিতে হইলে বাহির হইতে উহার সমান বস্তু দ্বারা উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঐ শক্তিকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে। উহা বদ্ধজীবে প্রসুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে—উহাকে ক্রিয়া কৌশলে, গুরু কৃপায়, যে কোনও উপায়েই হউক, জাগাইতে হইবে। তবে ত' ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইবে। কুণ্ডলিনী নিদ্রিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধতা, নিদ্রাভঙ্গে জীবের মুক্তি। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যেমন নিদ্রিত থাকে, জীবদেহে কুণ্ডলিনী সেই প্রকার নিদ্রিত থাকে। যিনি চেতন, তাঁহার সংস্পর্শে অচেতনও চেতন হইয়া উঠে। অচেতনেও চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আছে—চেতনের সঙ্গ বশতঃ উহা প্রকট হয়। চৈতন্যের অভিব্যক্ত রূপকেই গুরু বলে। বিশাল অব্যক্ত চৈতন্য যাহা জীব ধারাতেও আছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে ঐ অভিব্যক্ত চৈতন্য বা গুরুর দ্বারাই করিতে হয়। —একমাত্র গুরুই চেতন করিতে পারেন। গুরুশক্তির সঞ্চার কেবল মনুষ্য দেহেই হয়। তাই মনুষ্য-জন্মের এত প্রশংসা। মনুষ্যেতর জীবে সত্ত্ব মন্দ ভাবাপন্ন—সেখানে বিচারশক্তি, বিবেকশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

সদ্‌গুরু ও গুরুতত্ত্ব—সদ্‌গুরু নিজ সাধন বলে দীক্ষা প্রার্থীর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সাধনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়া এ জন্মের উপযোগী মন্ত্র দান করেন। দেবতার ধ্যানটা বেশী কিছু

নয়, উপযুক্ত ভাবে সাধন করিলে দেবতা স্বতঃ দর্শন দেন। মন্ত্রটি একটা বহিরাবরণ মাত্র, ঐ আবরণের অন্তরালে থাকে শক্তি। সদ্‌গুরু ঐ শক্তির চৈতন্য সম্পাদন-পূর্ব্বক উপযুক্ত আবরণে আবৃত করিয়া শিষ্যকে দান করেন। ঐ শক্তি সমন্বিত মন্ত্রই সাধককে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। * * *

গুরু পথ দেখাইয়া দেন, অগ্রসর হইতেও সাহায্য করেন. কিন্তু অগ্রসর হওয়া নিজ চেষ্টা সাধ্য। "গুরুর" অর্থ হইতেছে যিনি গুরুভার বহন করিতে পারেন। শাস্ত্র বলে—"গু" অন্ধকার এবং "রু" আলোকের বাচক। যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান, অথবা যিনি অন্ধকার রাজ্যে আলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসেন, তিনি গুরু। যিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তত্ত্ব-বস্তু দেখাইয়া দেন—আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করেন—যিনি অন্ধকে দৃষ্টি দান করিয়া অনন্ত মহাশক্তির বিরাট বিশ্ব-লীলা দেখাইতে দেখাইতে আত্মস্বরূপ দর্শনে স্থিতিলাভ করিবার যোগ্যতা দান করেন, তিনিই গুরু। যিনি নিজে জাগিয়াছেন, তিনিই নিদ্রিতকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন—নিদ্রিত নিদ্রিতকে জাগাইতে পারে না। * * যিনি জ্ঞানী, সদা-জাগ্রত, বিভূতি-সম্পন্ন ও দয়াময়, তিনিই জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকা দ্বারা তিমিরবদ্ধ জীবের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়া তাহার প্রজ্ঞানের উন্মীলন করিয়া দিতে পারেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না, সুতরাং বস্তুতঃ পরমেশ্বরই গুরু। তাঁহারই কৃপায় জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

'ঈশ্বরই গুরু' এই কথার অর্থ এই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, পাইতে পারে না। তিনি স্বয়ং গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে জীব অনন্ত কাল খুঁজিয়াও, তাঁহাকে ধরিবার পথ আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

তাঁহার স্বরূপভূত কৃপাশক্তি, তাঁহার ইচ্ছায় নামিয়া আসে। আসিয়া জীবকে ক্রমশঃ তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া লয়, পরে জীবকে শোধিত করিয়া স্বরূপে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। যে স্বচ্ছ আধার অবলম্বনে এই কৃপাশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকেই গুরু বলে। সুতরাং একমাত্র ঈশ্বরই গুরু—নির্ম্মল চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে মনুষ্যাদি কেহই গুরু হইতে পারে না। বদ্ধ জীবের সেই নির্ম্মল বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্যই তিনি নামিয়া আসেন। তিনি নামিয়া আসিয়া জীবের কাছে ধরা দেন, জীবকে আকর্ষণ করেন—তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি তাঁহাকে পাইত না—আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়। এই কৃপাই গুরুর শক্তি। গুরুর মুখ্য কার্য্যই হইতেছে জীবকে উঠাইয়া লওয়া।

গুরুর সেই নিত্যরূপ সাধারণতঃ লোকে দেখিতে পায় না। যাহা সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সেই পরম রূপ নহে। সংস্কার রঞ্জিত-নেত্রে সকলেই আপনাওন বাসনা রূপ গুরু দর্শন করিয়া থাকেন।

ঔপদেশিক জ্ঞান দানের জন্য দেহ আবশ্যক হয়। যোগিগণ বিদেহ হইলেও শুদ্ধ উপাদান গ্রহণ পূর্ব্বক সংকল্প মাত্রে দেহ নির্ম্মাণ করিয়া অধিষ্ঠান পুর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে জ্ঞান-ধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন। এই দেহকে নির্ম্মাণকায় বলে, নির্ম্মাণ-চিত্তও বলে। যিনি তাপ বা আলোক প্রার্থী, তাঁহাকে উদ্দীপিত অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। যে কোন কারণে, যে কোন উপায়ে যে কোনও স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে সেখান হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রজ্বলিত প্রদীপের সংস্পর্শে তাহাকে আপন বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া লইতে হইবে। যে আলো জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে—তাহা হইতে অন্ধকার দুর হয় না। কারণ তাহা অন্ধকারেও বর্ত্তমান আছে। তাহার সঙ্গে কিছুরই বিরোধ নাই। অন্ধকার দুর করিতে হইলে অভিব্যক্ত আলোকের আবশ্যকতা। সেই প্রকার সর্ব্ব ব্যাপক বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। যদিও অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা রূপে তাহা জীবেও আছে বটে, তথাপি তাহা অজ্ঞান নিবর্ত্তক নহে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য যে আধারে জ্ঞান বা বিদ্যারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, প্রজ্বলিত হইয়া আছে, সেখান হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞানের নাশ করিতে হইবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে—তাহাকেই "গুরু" বলে। একটি জ্বলন্ত দীপের সংস্পর্শে যেমন অপর একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ ঐ উজ্জ্বল আধারের সংস্পর্শে যখন বদ্ধ জীবের নিজের আধারেও সুপ্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন নিজের অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠেন। তখন ভিতরেই 'গুরু'কে

দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি আধার ভেদে পৃথক ভাবে প্রকাশমান হইলেও অগ্নিরূপে সত্তা এক ভিন্ন দুই নহে। প্রজ্বলিত অগ্নিই গুরু। জীবকে অন্তর্মুখ হইয়া, নিজের সুপ্ত আগুন জ্বালাইতে হয়। পরে সেই আগুনের সহায়তায় সহস্রারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে গমন করিতে পারে। * * গুরুর শ্রেষ্ঠ রূপ অব্যক্ত। প্রজ্বলিত অগ্নিই গুরু।

চেষ্টা—সব বিষয়েই নিজের চেষ্টা চাই। ঈশ্বরের কৃপা সকলের উপরই আছে। নিজে চেষ্টা করিয়া সেইটি উপলব্ধি করিতে হয়। চেষ্টা ভিন্ন অনুভবের মধ্যে তা' আসে না। * * নিজে চেষ্টা না করিলে কেহ কিছু করিয়া দিতে পারে না। নির্ম্মলী ফলে জলের ময়লা কাটে; তাই বলিয়া জলের কাছে বসিয়া নাম লইলেই জল পরিষ্কার হয় না। হাজার প্রার্থনা করিলেও নয়। চেষ্টা দ্বারা সেই ফলটাকে কাজে লাগাইতে হয়। কৃপা চেষ্টানুরূপ হইবে।

চিত্ত, চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মন—সূক্ষ্মদেহ মনের আধার, কিন্তু মনের কার্য্যের প্রকাশ হয় স্থূলদেহে। মন চঞ্চল নয়, চঞ্চল হইতেছে চিত্ত। জলের উপর সোলা যেমন ভাসে, চিত্তের উপর মনও তেমনি ভাসিয়া আছে। চিত্তের চঞ্চলতার দরুণই মন চঞ্চল হয়। চিত্তকে স্থির করাই হইতেছে, আসল কাজ। তাহার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে 'জপ ও যোগ'। চিত্তই সকল সংস্কারের আশ্রয়, মন চিত্ত হইতে একটু বিশুদ্ধতর সত্য। চিত্তের সকল প্রকার চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মনকে স্থির

সবল করাই 'যোগের' লক্ষ্য। চিত্তের উপর সঞ্চিত মল 'যোগ' দ্বারা দূর হয়। উহা চেষ্টা-সাপেক্ষ। আমের খোসা না ছাড়াইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। যোগে মনের খোসা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। মন তখন প্রকৃত বস্তুর আস্বাদন পায়।

চিৎশক্তি—জড়-শক্তির অন্তরালে চিৎশক্তি আছে। বস্তুতঃ জড়শক্তি চিৎশক্তিরই বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন অবস্থা মাত্র। ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহার ও অন্তঃকরণের নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতার পরম অবস্থায় চিৎশক্তি জাগিয়া উঠে।

জড় ও জড়-প্রকৃতি—মানুষ জড়-প্রকৃতি সম্পন্ন, তাই জড় লইয়া থাকে। একটা জড়কে যদি ছাড়ে, অমনি আর একটি জড়কে ধরে। তবে 'ক্রিয়া' ইত্যাদি করিয়া একটা আনন্দের আভাস পাইলে তখন জড়ের প্রতি ততটা টান থাকে না। ক্রমশ: বুঝা যায় এগুলি কিছু নয়, ঐটাই সত্য বস্তু। জগদম্বাই সব, তাঁহার ইচ্ছায় সব হয়। "আমি", "আমার" —এ সকল কিছু নয়। জগদম্বাকে পাইতে হইলে তার জন্য একটা তীব্র ব্যগ্রতা—আকুলি-বিকুলি চাই। দেখিবে যখনই আকুলি-বিকুলি করিয়া ডাকা হইয়াছে তখনই মনে একটা মঙ্গলময় শান্তির ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। * * * জগতের সব জিনিষই একটা আবরণে ঢাকা, যেমন কলার খোসা। খোসা সরাইলে আসল বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম'—তাহার অর্থও তাই। কর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার বিকাশ হইলে আসল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

জ্ঞান—'কর্ম্ম' করিতে করিতে জ্ঞান হয়, বিচার বু
খুলিয়া যায়, সত্যদর্শন হয়। দর্শন হইলেই বিশ্বাস হয়। ব
পড়ে যে জ্ঞান হয় সেটা শুষ্কজ্ঞান। যদি শাস্ত্র পড়া থেকে জ্ঞা
হ'ত তা' হ'লে বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে যেত
নানা শাস্ত্র পড়লে বরং মাথা ঘুলিয়া যায়। নানা মুনির না
মত, নিজে কাজ করলে বুঝা যায় কোন্‌টা কতখানি ঠিক।

জপ—জপ, জপের মতন হওয়া চাই, তবেই না তেম
ফল? গুরুদত্ত বিধিমতে, যথাযথ ভাবে সাধ্যমত মনটা নিয়ো
ত' কাজ! সর্ব্বদা বীজ জপা তাই। বীজ জপতে, জপতে
ভিতরে ভিতরে নির্ম্মাণের কাজ চলবে। দুঃখ-কষ্ট থাকবে না
শান্তি পাবে; সুখ নিশ্চয়ই হবে—হবে—হবে।

জীব ও স্বভাব—মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বভাবে
উপলব্ধি। জীব স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়াই দুঃখের কূপে
নিপতিত হইয়াছে। পুনরায় সাধনা প্রভৃতি দ্বারা স্বভাবে
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহার যাবতীয় অভাব মিটিয়
যাইবে। * * * রজঃ ও তমঃ হইতেই বন্ধন হয়—জীবে
স্বরূপগত উপাধি বিশুদ্ধ সত্বের অংশ। এইজন্যই জীবকে
ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। এই স্বরূপোপাধি লইয়া থাকিলে জীব
জীবভাবেই মুক্তিলাভ করে। জীব নিত্যবস্তু, ঈশ্বরও নিত্যবস্তু
—অংশও নিত্য, অংশীও নিত্য। অংশ বলিতে টুকরা মনে
করিও না—আভাস বুঝিও। তাই জীবমাত্রই ঈশ্বরের আভাস।
জীব যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের স্বরূপের সঙ্গে পরিচি

হয়, তখন নিজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়,—সে ঈশ্বরত্ব বা শিবভাব লাভ করে। ইহার পরের অবস্থাও আছে—কারণ, ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেই স্বভাবে স্থিতি হয় না। ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া পুনরায় তাহাকে নিরোধ করিলে তবে অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাহাই সকলের লক্ষ্য। * * *

মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে অভেদ না থাকিলেও ভেদাভেদ সম্বন্ধ—মুক্তিকালে অভেদ ও ভেদ উভয়ই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বদ্ধ জীব মলিন দ্বৈতভাবে আবদ্ধ। ঈশ্বর ও জীবের আত্মা অভিন্ন বস্তু। ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইতে শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল যে সৃষ্টির স্ফুরণ হয়, যাহাকে মুক্তজীব আত্মা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ ভাবে দেখে না, তাহা বদ্ধ জীবের নেত্রে সংকল্পাত্মক ভাবে স্ফুরিত হয় না—প্রতিভাসমান মনে হয় না, ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হয়। বদ্ধ জীব ঐ শুদ্ধ সংকল্পময় সৃষ্টিকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া অচেতন, পৃথক্ ও মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ইহার কারণ অজ্ঞান—অর্থাৎ তাহার আত্মজ্ঞান নাই বলিয়া বুঝিতে পারে না যে ঐ সৃষ্টি আত্ম-শক্তিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাই উহা সত্য মনে করে। মনে করে, যেন তাহার নিজের সত্তা ছাড়া উহার একটা পৃথক্ সত্ত্বা আছে। সে সৃষ্টি দৃষ্টিবাদী হয়। আত্মজ্ঞানের প্রথম বিকাশ মাত্রই দৃষ্টি-সমকালীন সৃষ্টি হয়, সিদ্ধ সংকল্পাবস্থার উদয় হয়—তখন সে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী হইয়া থাকে। ইহার পরাবস্থায় সৃষ্টিই থাকে না। তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উদয় হইবামাত্র তমো নিবৃত্তি হয়—সেজন্য রজঃও স্থির হইয়া

সত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়—বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকটিত হয়। তখন আ
জীব ভেল্কি দেখিয়া ভুলে না।

জীবের জীবত্ব কখনই যায় না—মুক্ত হইলেও জীব জী
থাকে। তবে তাহাতে ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মভাবের বিকাশ হয়, এ
মাত্র বিশেষ। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব আছে, জীবেও তেম
ঈশ্বর ভাব আছে—যখন যে ভাবের প্রাধান্য হয়, তখন তাহ
ক্রিয়াশীল হয় ও আপাত দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। * * ঈশ্ব
জীবশক্তি আছে বলিয়াই তিনি প্রয়োজন অনুসারে প্রকটি
হইতে পারেন। সেই প্রকার, জীবেও অব্যক্ত ভাবে ঐশীশ
আছে বলিয়া সাধনা দ্বারা মুক্তাবস্থায় তাহার বিকাশ হয়।
থাকিলে কদাচ হইতে পারিত না। কারণ যাহাতে যাহা না
তাহাতে তাহার স্ফূর্ত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না।

জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জড়শক্তি সম্বন্ধে
এই কথাই বলা যাইতে পারে। যাহাকে তোমরা জড় বলি
বর্ণনা কর, তাহাতেও জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব, অর্থাৎ চৈত
ও আনন্দ, উভয়ই আছে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের বিকা
হইলে তাহারই প্রভাবে জড় বস্তুর সর্ব্বত্রই চৈতন্য দেদীপ্যমা
দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন ও শুষ্ক জড় পদার্থ বলি
জগতে কিছুই নাই, ইহা তখন বুঝিতে পারা যায়। ইহাকে
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলে, জ্ঞানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, জ
বস্তুর সত্তাই অব্যক্ত হইয়া যায়, এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিরাজমা
থাকে। জীব বল, শিব বল, জড় বল সবই এক মহাশক্তির

বিভিন্ন রূপ—"একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" সবই সত্য, অথচ মূলে কিছুই নাই—সাম্যকালে সব একাকার হইয়া এক সত্তাতে পরিণত হইয়া যায়।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই মহাশক্তির ক্রীড়া-পীঠ। ইনি যেমন সকলকে চালান, সকলেই তেমনই চলে। ইহাকে ছাড়িয়া কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই। তবে জীবের দায়িত্ব কি? শুভাশুভের জন্য জীবের সামর্থ্য কোথায়? স্বভাব যে সকলকে চালান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে একটু কথা আছে। জীব যখন কর্ম্ম করে তখন সে অভিমান বশতঃ নিজকে কর্ত্তা মনে করে, তাই তার ফলাফল ভোগ হয়।

দেহাত্মবোধ আছে বলিয়া এই অভিমান অবশ্যম্ভাবী। যখন দেহাত্মবোধ থাকিবে না, চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থি উন্মুক্ত হইবে, কুণ্ডলিনী-শক্তি চৈতন্য লাভ করিবে, তখন এই অভিমান থাকিবে না। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ অভিমান বৃত্তি একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। লৌকিক অভিমান তিরোহিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান এবং আত্মজ্ঞতার অভিমান থাকিয়া যায়। সুখ-দুঃখের অনুভব বা ভোগ স্থূলদেহে হইয়া থাকে। অহংকার মূলক ক্রিয়ার আশ্রয়-স্থল স্থূলদেহ। জীব যখন নিজকে সর্ব্বাংশে আশ্রিত বলিয়া বুঝে, স্ব-ভাবস্থ বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না বলিয়া ভোগও থাকে না। যতক্ষণ অহংকার বিগলিত না হইতেছে, ততক্ষণ জোর করিয়া পুণ্য-পাপের অতীত হওয়া চলে না।

ত্যাগ—ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ভোগের অধিকার জন্মে না; আবার ভোগাধিকার না থাকিলে ত্যাগের অধিকার হয় না। যাহারা অমৃত পিপাসু, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। "ত্যাগেনৈকেন দেবা অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগই অমৃত্ব লাভের একমাত্র পথ। ত্যাগরূপ যজ্ঞ ভিন্ন অমৃত বা সুধার প্রাপ্তি দুর্ঘট। ত্যাগাত্মক সোপানে আরোহণ করিয়াই দিব্য-ভূমিতে যাইতে হয়। ঐ দিব্যাবস্থায় ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হইয়া যায়।

ত্যাগ করিবার জন্যই অর্জ্জন আবশ্যক। অর্জ্জন করিয়া সব আপন করিতে হইবে। বিশ্ব-জগৎ আত্মরূপে পরিণত হইবে। কিছুই পর থাকিবে না। দেখিবে,—প্রথমতঃ সবই তোমার স্বকীয় বিভূতি। এই জগৎটী তোমারই আপন শক্তি বিকাশ—আত্ম-বিভূতি। দ্বিতীয়তঃ বুঝিবে সবই তুমিময়— তুমি সব সাজিয়া আছ। অর্জ্জনের চরমাবস্থায় সর্ব্বত্রই নিজকেই দেখিতে পাওয়া যায়—সবই নিজের রূপ বলিয়া বোধ আসে। আপন-রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু থাকে না। এই অবস্থায় পৌঁছিলে নিজের মধ্যেই একটি অসীম অনন্ত বস্তুর আভাস জাগিয়া উঠে। ঐটিই তখন আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরে ঐ অসীম বস্তুতে সর্ব্বময় 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিতে হয়। ইহাই আত্ম-নিবেদন বা ত্যাগ! ইহার ফলেই পরমানন্দ লাভ বা অমৃতত্ব প্রাপ্তি—যাহাকে দিব্যভাব বলে। ঐ অসীম বস্তুই নিজের অন্তর্যামী রূপে অন্তরাত্মায় প্রকটিত হন। ঐ পরমানন্দের আস্বাদন বা অমৃত

পান বস্তুতঃ মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্তন্য-রস পান বা পরম ঐশ্বর্য্য লাভ। মায়ের কোলে শিশু হইতে হইলে আত্ম-নিবেদন পূর্ব্বক সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিবেদন করিবার পূর্ব্বে নৈবেদ্যের সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাকে তোমরা যোগ-বিভূতি বল, যদি তাহা বাস্তবিক হয়, তবে উহা এই নৈবেদ্য-সংগ্রহ। কিন্তু কিছুরই বিনাশ নাই। সুতরাং জীব যখন শিবত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ করে, তখনও তাহার জীবত্ব ঘোচে না।

দীক্ষাতত্ত্ব—দীক্ষা ভিন্ন জীবের পশুত্ব ঘুচে না—পাপক্ষয় হয় না—বিশুদ্ধ অবস্থার উপলব্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহার দীক্ষা হয় নাই, তাহার দেহ অশুদ্ধ। অশুদ্ধ দেহে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে জীবের সদ্‌গতি লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। শাস্ত্রে বহু প্রকার দীক্ষার বর্ণনা থাকিলেও দীক্ষার ব্যাপার সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন। একমাত্র পরমেশ্বরই জগতের আদিগুরু। তাঁহা হইতে নানা দিকে নানা রূপ জ্ঞান-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। যে কোন ধারায় তাঁহার কোন বিশিষ্ট শক্তি প্রকটিত হইয়াছে, সেই ধারায় নিরবচ্ছিন্ন রূপে চৈতন্যের প্রকাশ থাকে। * * গুরুর শক্তি শিষ্যে সঞ্চাবিত হয়, শিষ্যের শক্তি তাহার শিষ্যে—এই প্রকার এক একটি করিয়া প্রতি আধারে ক্রমশঃ শক্তির ধারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গুরু-শিষ্য পরম্পরাকেই শাস্ত্রে 'সম্প্রদায়' বলা হইয়াছে। গুরু দীক্ষার দ্বারা শিষ্যকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন। দীক্ষার

ফলে জীব শুধু যে পরমেশ্বরের শক্তি বিশিষ্ট লাভ করে, তাহা নহে, ঐ শক্তির প্রকাশ যে কোনও আধারে আছে, তাহার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হইয়া যায়। * * * প্রকৃত দীক্ষা একবার ভিন্ন বহুবার হয় না, কিন্তু না হইলেও স্তরে স্তরে নব নব রূপে শক্তির উন্মেষ হওয়ার দরুণ বহুবার দীক্ষা হয় বলিলেও দোষ হয় না। ইহাকে ক্রম দীক্ষা বলে। কিন্তু দীক্ষার যাহা মুল লক্ষণ, তাহা সকলের অন্তিম স্তরেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানশক্তি একবার ভিন্ন দুইবার অভিব্যক্ত হয় না। শিষ্য গুরূপদিষ্ট 'কর্ম্ম' অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে। জ্ঞানের পূর্ণতা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি সাপেক্ষ। ইহা হইলেই পূর্ণাভিষেক সম্পন্ন হয়,—জীব পাশ-মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করে।—ইহাই প্রকৃত দীক্ষা। ইহার অব্যবহিত পরেই মুক্তি হয়। * * *

দীক্ষা চারি প্রকারের :—

১। মন্ত্র বিচার পূর্ব্বক দীক্ষা।

২। কর্ত্তব্যোপদেশ মুলক দীক্ষা।

৩। বীজ উদ্ধার পূর্ব্বক দীক্ষা।

৪। দেবতা প্রদর্শন দ্বারা দীক্ষা।

আমাদের যে দীক্ষা হইয়াছে, উহা প্রথম প্রকারের দীক্ষা। এই প্রকার দীক্ষার পদ্ধতিতে কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। তিন বা ততোধিক জন্মের সাধনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মন্ত্র নির্ণয় করা হয়;

দান—দানকারী কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পায় না। অল্প, অর্থাৎ ভোজনার্থ যে দান তাহা গরীব দুঃখীকেই দিতে হয়; অধিক দান সৎপাত্রে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভিক্ষুককে কিছু ভিক্ষা (যেমন দুই চারিটি পয়সা) দিবে। ভিক্ষার্থীকে-একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই, তাহা হইলে সে তোমার সকল পুণ্য হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। আর ভিক্ষা দিলে তুমি তাহার পুণ্য আকর্ষণ করিবে।

মাঝে মাঝে দান ক'রতে হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্ব তিথিতে কিছু কিছু দান করা ভাল। আর, কুমারী ভোজন করাতেও হয়।

দৈব ও পুরুষকার—চেষ্টা কর—উপযুক্তরূপ চেষ্টা কর। পুরুষকার চাই। চাকরী যে হবে তেমন কি চেষ্টা ক'রছ বল দেখি? কেবল দৈবের উপর ভরসা করলে চলে না। দৈব ও পুরুষকার—এক পাখীর দুইটী ডানার মত। এক ডানাতে পাখী উড়তে পারে না। পুরুষকার অবলম্বন করলে দৈব সহায় হয়। আর তেমন নির্ভরের সহিত দৈবকে—ঈশ্বরের কৃপাকে, ধ'রলে পুরুষকারের প্রবৃত্তি আসে। * * *

জাগিয়া, দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিবার পরিশ্রম কেহই স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু পরিশ্রম করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা করিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। এই চেষ্টাই সাধনা বা পুরুষকার। ইহাকে অবলম্বন না করিয়া শুধু দৈবের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ।

***দুষ্প্রবৃত্তি*—(জীবের নীচ ভাব)—জীবের নীচ-ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতেই ফুটিয়া উঠে স্থূল বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদুর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘেরিয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ দশা প্রাপ্ত হওয়ার আশা নাই। * * *

আমার কাছে যাহারা মন্ত্র নিয়াছে, তাহারা যদি আর দুষ্প্রবৃত্তির কাজ না করে, তবে তাহাদের কাহারও দুঃখ দুর্গতির কারণ নাই। অনবরত কলহ, ঈর্ষ্যা এবং অন্য সকল দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, রোজ এ-বেলা আধ ঘণ্টা, ও-বেলা আধ ঘণ্টা করিয়া আহ্নিকে বসো ; ফলাফল আমার উপর ছাড়িয়া দাও ; দেখি কেমন করিয়া দুর্গতি হয় ? বাপু, সবই নিজের কর্ম্মের ফল, সেই কর্ম্ম আর বাড়াইও না। * * * বাপু, কেবল দুঃখটুকুই দেখ, কিন্তু কত রাশি রাশি দুষ্কৃতির ভোগ ঐ দুঃখটুকুতে কাটিয়া যাইতেছে তাহা ত' দেখ না। দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি হইবে না। হাঁ, মনের ধর্ম্মে সময় সময় দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবে বই কি ? কিন্তু মনের বলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দমন করা উচিত, তাকে প্রশ্রয় দিলেই সে বিপদ ঘটাইবে। * *

তুষ্টভাবকে অনবরত নাম স্মরণের দ্বারাই মন হইতে দূর করা যায়। নাম করিতে করিতেও যদি তুষ্ট ভাব মনে আসে, তাতে ক্ষতি করতে পারে না। সামান্য একটু আগুন রাশীকৃত আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দিতে পারে।

দুঃখ—দুঃখ, কষ্ট, যাতনা—মানুষের উপকারই করে, অন্নপকার করে না। মানুষের সাধারণতঃ যেরূপ স্বভাব, তাতে দুঃখ-কষ্ট না থাকলে, তারা অতি দুরন্ত হ'য়ে উঠতো, যাকে বলে হাতে মাথা কেটে ফেলা, তাই করতো। এক যোগী আমার সাক্ষাতে একেবার এক কুষ্ঠ রোগীকে এই ব'লে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তোমার রোগ আরও কিছুদিন থাক্। * * * জীব যখন বাস্তবিকই সংসার তাপে তাপিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে, যখন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইতে তাহার অন্তরের যাবতীয় মল অপগত হইয়া যায়, যখন তাহার সরল ও স্বচ্ছ প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, সেই আদ্যাশক্তিই তাহার নিকট মহাপুরুষরূপে, অভয়প্রদ আশ্রয় স্বরূপ হইয়া ও তাহার শোকাপনোদনের জন্য প্রকটিত হন। * * * তুমি আপন অন্তঃকরণ হইতে কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, বদখেয়াল, অসদ্‌ভাব—এই সব বিদূরিত করিয়া ফেল, দেখিতে পাইবে, এ জগতে কেহই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিবে না।—ক্রিয়া অনুসারেই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।

৺দুর্গার বোধন—* * সাধারণ বোধন হইতে অকাল-বোধনের বিশেষত্ব এই যে, অসময়ে বোধন করিতে গেলে তীব্র-

শক্তির প্রয়োজন হয়,—ফলও অধিক হয়।—মা ত' সর্ব্বদা জেগেই আছেন, তাঁর আবার বোধন কি? তাঁর দ্বারা বৃহৎ কাজ করাইয়া নিতে বৃহৎ চেষ্টার প্রয়োজন। রামচন্দ্র আশু ফল চাহিয়া ছিলেন, তাই তাঁহাকে অসাধারণ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সময়ে ফল কতকটা স্বভাবতঃ হয়, অসময়ের ফল তীব্র চেষ্টার দ্বারা করিয়া নিতে হয়।

ধর্ম্মের ভিত্তি ও ধর্ম্ম-জীবন—তাঁকে জানবার চেষ্টা—ইহাই হ'ল ধর্ম্মের ভিত্তি। সংসারে যাবতীয় বস্তু ভগবান দিয়াছেন পার্থিব ভালবাসার মধ্য দিয়া তাঁকেই ভালবাসবার জন্য। কষ্ট কেন হচ্ছে—এ কথার উত্তর মানুষ যদি খোঁজে, তা হ'লে শান্তি নিশ্চয়ই আসবে। মানুষ কেবল অন্যের দোষ অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়, গুণের দিকটা অন্বেষণ করে না। যাকে বিশ্বাস ক'রবে, তার সঙ্গে আগে ব্যবহার করা খুবই আবশ্যক। তা' না হ'লে প্রতারিত হ'তে হয়। * * * ধর্ম্মের তত্ত্ব যে গুহা-নিহিত, তাহা সকল দেশের শাস্ত্রেরই চরম সিদ্ধান্ত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সত্যের যে রহস্যময় মূর্ত্তি আত্ম-প্রকাশ করে তাহাই ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। কিন্তু বাহ্যভাবাপন্ন লঘুচিত্ত জন-সাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ হৃদয়ের গভীর প্রদেশে নিজের ইন্দ্রিয়, মন এবং অহংকার বৃত্তি সকলকে নিমগ্ন করিতে না পারিলে, অনাদি-সঞ্চিত অনুকুল এবং প্রতিকুল বাসনারাজির আকর্ষণ হইতে নিজকে জ্ঞাতসারে পৃথক্ করিয়া সাক্ষিরূপে

অবস্থিত হইতে না পারিলে, জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া নিজকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম-তত্ত্বের স্বরূপ কখনই আয়ত্ত হইতে পারে না। মহাজন ধর্ম্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্ম-জীবনে উহার পরিণাম এবং বিকাশ সম্পাদন পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহার ধর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়াই সূক্ষ্ম ও জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া থাকে।

নাভি ধৌতি, প্রাণায়াম ও কুম্ভক—প্রাণায়ামের দ্বারা সুষুম্নার দ্বার খোলার দ্বারা বিশেষ কিছু হয় না। প্রকৃত পক্ষে নাভিধৌতি না হইলে শরীর ঊর্দ্ধে উঠে না। কিরাতধৌতি ও নাভিধৌতির মত একটী প্রক্রিয়া আছে যা' থেকে কিরাত-কুম্ভক হয়। সেটি না হ'লে চাত্বর (স্থূলদেহ সহ আকাশ-গমন) হয় না। কিরাতধৌতি আমাদের সম্প্রদায়েই আছে। আর কাহারও মধ্যে ত ঐ সব ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * * কুম্ভক চারি প্রকার—নাসাকুম্ভক, মুখদ্বারা কুম্ভক, গুহ্যদ্বার দিয়া কুম্ভক ও ক্রিয়ার দ্বারা কুম্ভক। ক্রিয়ার দ্বারা যে কুম্ভক, তাহা হয় নাভিদ্বার দিয়া, পরে উহা হইতে ক্রমে সমস্ত লোমকূপ দিয়াও হয়। ইহার মধ্যে পার্থক্য এই যে—নাক, মুখ ও গুহ্যদ্বার দিয়া যে কুম্ভক—তাহা হইলে আত্মবোধ থাকে না। কুম্ভক ঠিক ঠিক হইলেই মাটি ছাড়িয়া উপরে উঠিবে; কিন্তু নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার দিয়া কুম্ভককারী নিজে বুঝিতে পারে না যে তাহার দেহ উঠিয়াছে বা উঠিতেছে। সে একটা ভাবে

ডুবিয়া থাকে, এবং তাহাতে নিজ ব্যক্তিত্ববোধ রাখিতে পারে না। 'ক্রিয়ার' দ্বারা কুম্ভকে যোগী সব জানেন, এমন কি ইচ্ছামত দেহ চালনাও করিতে পারেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত থাকে, এমন কি লোক-ব্যবহারও তিনি সম্পন্ন করিতে পারেন। 'ক্রিয়া' কুম্ভক দ্বারা দেহের আকর্ষণী শক্তিও খুব বাড়ে, যাহা ইচ্ছা তাহা আকর্ষণ করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা ধরিয়া রাখা যায়। * * * যে যোগী নাভি-ধৌতি ও কিরাত-ধৌতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার নাভিকুম্ভ হইতে ধৌতিকালে একটি জ্যোতিঃ প্রবাহ স্তম্ভাকারে বহির্গত হইয়া স্বতঃ শিরোদেশে গমন করে, ও দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাহির হইতে বৈদ্যুতিক ধনুর আকার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তি তীব্রভাবে বাহ্যাকাশে প্রকাশিত হইলে সমীপস্থ দুর্ব্বল দর্শকের পক্ষে উহাতে জ্ঞান হারাইবার সম্ভাবনা।

নাভি-কমলের বর্ণ যেমন বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তিমাভাযুক্ত, হৃদয়-কমল সে প্রকার নহে। প্রত্যেকটী কমলই বাহির করা যায়। * * * ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে চান্বর হয় না। চান্বরের পূর্ব্বে কতকগুলি ধৌতি আগে অভ্যাস করা দরকার। সেগুলি হলে চান্বর হয়। চান্বরের সময় শবাসন করে শুতে হয়। চান্বরে দেহ রেখেও যাওয়া যায়, নিয়েও যাওয়া যায়। রেখে যেতে হ'লে ঘর ভাল করে বন্ধ করে যেতে হয়, কেননা কেহ শরীরটা ছুঁয়ে না ফেলে। অন্যে ছুঁয়ে ফেললে সে শরীরে আর ফিরে আসা যায় না। দেহ নিয়ে যাবার সময় চোখ খুলে না

রাখাই ভাল। আলো, বাতাস লাগিয়া অনিষ্ট হতে পারে; এই চোখ দিয়া পথ দেখা যায় না। সে জন্য অন্য চোখ আছে। তবে পথ দেখার কোনও প্রয়োজন নাই। যেখানে যেতে হবে তার সঙ্কল্প করে শবাসন ক'রলেই, সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। খুব অল্প সময়েই যাওয়া যায়। জলন্ধর থেকে বর্দ্ধমান বিশ মিনিটে আমি গিয়েছি। তার চেয়েও অল্প সময়ে যাওয়া চলে।

ধ্যান—ধ্যান কালে সমস্ত দেহের ধ্যান করা অপেক্ষা পাদপদ্মের ধ্যান করাই ভাল, কারণ পায়েই তড়িৎ-শক্তি বেশী। পাদপদ্ম ধ্যানে অধিক তড়িৎ সঞ্চারিত হয়।

মানুষের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দিয়া তড়িৎ-শক্তি বেশী চালিত হয়, সেইজন্য মাত্র ঐ আঙ্গুলটি দিয়া কোন কাজ,—দাঁত-মাজা, কিছু দেখান ইত্যাদি করিতে নাই,—তাহাতে তাড়িতের অপচয় হয়।

নিষ্কাম-কর্ম্ম ও পুরুষকার—কর্ম্ম মাত্রই পুরুষকার নহে, নিষ্কাম-কর্ম্ম পুরুষের কৃতি-সাধ্য নহে বলিয়া উহাকে পুরুষকার বলা উচিত নহে, উহা প্রাকৃতিক কর্ম্ম। পুরুষকারের মূলে অভিমান আছে; নিষ্কাম-কর্ম্মের মূলে অভিমান বা কর্ত্তৃত্ববোধ নাই। বস্তুতঃ গুরু কৃপাতে মধ্য-পথ খুলিয়া গেলে স্বভাবের প্রেরণায় যে নিবৃত্ত কর্ম্ম হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। উহাতে বন্ধন ত' হয়ই না, বন্ধন খুলিয়া যায় ও জগতের কল্যাণ হয়। নিষ্কাম-কর্ম্ম ভিন্ন চিত্ত-শুদ্ধি ও জ্ঞানোদয় অসম্ভব।

ইহারই অপর নাম যোগ—ইহা 'কর্ম্মের' কৌশল। যোগ-রূপ নিবৃত্ত কর্ম্ম ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্মই কামনাধিকৃত ও বন্ধনের হেতু।

নিত্য ও অনিত্য কর্ম্ম — অনিত্য বস্তু দিয়াই নিত্য বস্তু পাইতে হয়। বাস্তবিক, জগতে অনিত্য কিছুই নাই—সবই নিত্য। কর্ম্ম কর। কর্ম্মভ্যো নমঃ।

নাভি ও মন্ত্রের প্রত্যক্ষতা—নাভি হইতে প্রণব প্রভৃতি সকল মন্ত্রই উদিত হয়, মূলাধার হইতেও বলিতে পার। কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হইলেই একটী নাদময়ী শক্তির ধারা সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। তখন সহস্রার হইতে অপর একটী ধারা প্রবাহিত হইয়া আধোমার্গে আসিকে থাকে। আজ্ঞাচক্রে বিন্দু স্থানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া একটি সুস্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমনীয় জ্যোতির আকারে প্রকাশিত হয়। উহা বহিরাকাশে প্রতিফলিত হইলেই নেত্রের সম্মুখে বাহ্যভাবে প্রকাশিত হয়।

নির্ভাবনা—ভাবনার কি অন্ত আছে? যোগের দ্বারা কিছু পইেলেও ভাবনা হয়—এ টুকু রাখা যাবে কিনা, আরও পাওয়া যাবে কিনা। সম্পুর্ণ নির্ভাবনার একটা অবস্থা আছে; তবে সেটা জড় হইয়া থাকার মত। তাতে আনন্দ নাই। যোগী সেটা চায় না। যোগী চায় আরও দেখিব, আরও জানিব। কর্ম্মেই আনন্দ।

নির্ব্বাণ—যোগাবস্থাই সকলের প্রার্থনীয়। যিনি যাহাই মুখে বলুন, বাস্তবিক পক্ষে যোগাবস্থাই সকলের কাম্য। নির্ব্বাণ কাহারও প্রার্থনীয় নহে। বোধাবোধের অতীত অবস্থাকে ঠিক নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাণের পরে আর বোধ থাকে না। নির্ব্বাণ হ'লো বলহীনের—যাহার স্বত্ব জন্মায় নাই, সেই প্রবল শক্তির প্রভাবে আপন বোধ হারাইয়া অনন্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিশিয়া যায়। যিনি যোগী—তাঁহার নির্ব্বাণ হয় না। তিনি মহাশক্তির উপাদানে নিজকে গঠিত করিয়াছেন বলিয়া কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

নির্ভরতা বৈরাগ্য ও শান্তি—'ক্রিয়া' কর, 'ক্রিয়া' কর, তাহাতেই নির্ভর আসিবে, সকল বুঝিতে পারিবে, আর বিচলিত হইবে না। 'ক্রিয়া' করিলে ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। তাহা ত' অনবরতই মাথার উপর ঝরিতেছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ কি? স্ত্রীর পিছনে, অর্থের পিছনে, ভাল খাদ্যের পিছনে ছুটিতেছ,—তখন তোমরা কর্ত্তা; কেবল সাধন-ভজনের বেলায়, 'বাবা, কৃপা করুন'। এগুলি তোমাদের যেমন আকর্ষণ করে, আহ্নিক তেমন আকর্ষণ করে না। উহা আকর্ষণ যাহাতে করে সেই জন্য ত' বলি 'ক্রিয়া' কর। 'ক্রিয়া' করিতে করিতে রসবোধ হইবে। রস পাইলে তাহাতে অনুরক্তি আসিবে। সে রসে মজিলে অন্ত কিছুই আর আকর্ষণ করিতে পারিবে না। 'ক্রিয়ার' প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে; কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবে না। কোনও বিষয়ে চিন্তা না করার অর্থ তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর।

* * * বিবেক হইল বিতৃষ্ণা। নির্ভর মানে বিশেষ প্রকার ভর। নির্ভরের পূর্ব্বে ভর হয়। ভরে সংশয় থাকে। নির্ভরে সংশয় থাকে না। বৈরাগ্য দ্বারা হয় ছাড়া, ও নির্ভর দ্বারা হয় ধরা।

দীর্ঘকাল সংযম, শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কঠোর সাধনা করিলে, কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রকৃত নির্ভরের অবস্থায় সত্যই উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু গোড়া হইতেই সাধনা পরিত্যাগ করিলে ঐ অবস্থায় কখনও আবির্ভূত হইতে পারে না। প্রথমে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম না করিয়া নিষ্কর্ম্ম অবস্থার বিকাশ কি প্রকারে হইতে পারে ? সমস্ত গীতাতে কর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে—শুধু অষ্টাদশ অধ্যায়ের অবসানে কর্ম্মত্যাগ ও শরণাপন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত দেখা যায়।

পরমাত্মা—প্রত্যেক দেহেই দুইটী আত্মা আছেন—একটি ভোক্তা জীব, অপরটী ভোগ নির্মুক্ত শুদ্ধ দ্রষ্টা বা সাক্ষী ; অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে রহিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপক হইলেও তাঁহার প্রকাশমানতা, অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র সমান নহে। কেবল সত্তা হইতেই ইষ্টসিদ্ধি হয় না। সৎ হইয়াও যদি অব্যক্ত হয়, তবে তাহার দ্বারা কাহারও কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এই প্রকার নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সৎকে লৌকিক মানদণ্ডে অসৎ বলিলেও ক্ষতি হয় না। অতএব সৎকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, তবে তাহার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে

পারিবে। আগুন না আছে এমন কোনও স্থান নাই ; প্রসুপ্ত-রূপে অগ্নি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে এ কথা ধ্রুব সত্য ; কিন্তু সে অগ্নি হইতে তাপ বা আলোক কিছুই পাওয়া যায় না। যিনি তাপ বা আলোক প্রার্থী, তাঁহাকে উদ্দীপ্ত অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। যে কোনও কারণে, যে কোনও উপায়ে, কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সেখান হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রজ্বলিত প্রদীপের সংস্পর্শে তাহাকে আপন বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া লইতে হইবে। যে আলোক জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে—তাহা হইতে অন্ধকার দূর হয় না। কারণ, তাহা অন্ধকারেও বর্ত্তমান আছে। তাহার সঙ্গে কিছুরই বিরোধ নাই। অন্ধকার দূর করিতে হইলে অভিব্যক্ত আলোকের আবশ্যকতা। সেই প্রকার সর্ব্বত্র ব্যাপক বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। যদিও অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা রূপে তাহা জীবেও আছে বটে, তথাপি তাহা অজ্ঞান নিবর্ত্তক নহে।

পরমানন্দ—পরমানন্দের আস্বাদন—উহাই ত' মুক্তি। ত্রিতাপের জ্বালায় অধীর জীব দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না—সত্য বলিতে কি, শান্তি বা স্থিতি কোথাও হইতেছে না। ঐ অমৃত পান না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি নাই। ঐ পরমানন্দ-রস যখন সে পাইবে, তখন তাহার সকল ভ্রমণ সমাপ্ত হইবে। মায়ের কোলের শিশু আবার মায়ের কোলে আরোহণ করিয়া মাতৃ-স্তন্যের

রসাস্বাদন করিয়া বি:ভোর হইয়া যাইবে। এই অমৃত পান
মায়ের প্রসাদ। ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ লইতে হয়, যজ্ঞ
করিয়া যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করিতে হয়—ইহাই ঐ প্রসা
বা অমৃত।

প্রণব ও বীজ—প্রণবের সঙ্গে বীজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ
—একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে
না। প্রণব বীজের পুট স্বরূপ-বীজ শক্তি, প্রণব উহার ব্রহ্মরূপী
সেতু। তুষ ভিন্ন শুধু তণ্ডুল কিংবা তণ্ডুল ব্যতিরেকে শুধু তুষ
যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্বৎ বীজ ভিন্ন প্রণব, কিংবা প্রণব ভিন্ন
কেবল মাত্র বীজ ফল উৎপাদন করে না। উভয়ের সম্বন্ধ
আবশ্যক। তবে বীজের মধ্যে প্রণবের উপাদান অধিক
পরিমাণে আছে বলিয়া, পৃথক্ ভাবে প্রণবকে গ্রহণ না করিলেও
যথাসময়ে উহা আপনিই ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। কিন্তু
শুধু প্রণব নিষ্ফল! তবে, পূর্ব্বে বীজ সংগৃহীত থাকিলে প্রণব
তাহার বিকাশে সাহায্য করিতে পারে। আলোক, জল, বায়ু
প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও যেমন বীজ ভিন্ন বৃক্ষ হইতে
পারে না, সেই প্রকার বীজ না থাকিলে কেবল প্রণব হইতে
পরমামৃতের আস্বাদন পাওয়া যায় না। প্রণবের কার্য্য
প্রস্ফুটিত করা, প্রকাশিত করা,—সত্তাকে অভিব্যক্ত করা, কিন্তু
যাহাকে ফুটাইতে হইবে বা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা ও
চাই।—তাহাই সত্ত্ব বা শক্তি যাহা বীজ-মন্ত্রের বাচ্যার্থ। এই
বিশুদ্ধ সত্ত্বোপহিত চৈতন্যই দেবতার তত্ত্ব।

প্রাক্তন কর্ম্ম—প্রাক্তন কর্ম্ম কাহার কিরূপ আছে, তাহা ত' তোমাদের জানা নাই। সুতরাং প্রাক্তন কর্ম্মেহ নাম করিয়া শিথিল প্রযত্ন থাকা সদ্‌বিবেচনার চিহ্ন নহে। "আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম ভাল নহে—সুতরাং চেষ্টা করিয়া কি লাভ",—এই প্রকার মানসিক ভাব দূষণীয়। সেই প্রকার পূর্ব্বজন্মের সাধুত্ব ও প্রবলতা কল্পনা করিয়া চেষ্টার অনাবশ্যকতা মনে করাও দূষণীয়। পূর্ব্বজন্ম ভালই থাকুক, আর মন্দই থাকুক, অল্পই থাকুক, আর অধিকই থাকুক—তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তোমার জ্ঞানের অগোচর, তাহা লইয়া বৃথা চিন্তায় ফল কি? বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নবীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কৃতকর্ম্ম কখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। যে সম্পুর্ণ ভাবে অলস থাকে, সে নিজের প্রাক্তন কর্ম্মের ফললাভ হইতেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং কোন স্থলেই সাধু চেষ্টা বিফল হইবার নহে। শুভকর্ম্ম অল্প হইলেও কল্যাণ প্রসব করিয়া থাকে।

পাপ—পাপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পাপ, মহাপাপ, অতিপাপ ও বিষম পাপ। পাপ ও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু অতিপাপ ও বিষম পাপের ধ্বংস যোগ ভিন্ন হয় না। পরপিণ্ডের ধন প্রত্যাশা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পরের বিষয় -আশয় ভোগ করিবার প্রত্যাশা করা উচিত নহে। উহা একটি অতিপাপ, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

পুরুষকার—কৃপা যেমন ঈশ্বরের ধর্ম্ম, পুরুষকার তেমনই পুরুষের অর্থাৎ জীবের ধর্ম্ম। ঈশ্বর ভিন্ন জীবের সত্তা

কাল্পনিক। সুতরাং পুরুষকার এবং কৃপা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মও খণ্ডন করা যায়; বিধির বিধান উলটান যায়। শুধু কৃপা হইলেই ত' ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, যদি না তাহার সহিত পুরুষকারের যোগ থাকে। তীব্র পুরুষকার থাকিলে, আবশ্যক কৃপা আপনিই জাগে—আশ্রয়-গ্রহণ আপনিই হইয়া যায়। জীবের প্রসুপ্ত শক্তিকে জাগাইবার জন্যই ক্রিয়া বা পুরুষকারের প্রয়োজন। জড়ের অন্তরালে এই চিৎশক্তি রহিয়াছে। শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তিলাভ হয় না। সেই মহাশক্তির আরাধনা কর, নিজকে শক্তিময় কর, তেজোময় কর।

প্রেম—ভক্তির পরের অবস্থা প্রেম। ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ইহা পরমানন্দস্বরূপ। অনেকে ইহাকেই অদ্বৈতসিদ্ধি বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থা পূর্ণত্বের দ্বারদেশ – মহাশক্তি বা অসীম তত্ত্বে প্রবেশের মুখ। ইহার পরেই অকূল পাথার—সেখানে বাক্য বা মনের গতি ন্যই। অসীম বা অনন্ত সত্তা তত্ত্বাতীত হইলেও তত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত কিছুই নাই। ইহা এক হিসাবে ঈশ্বরতত্ত্বেরও অতীত অবস্থা – পূর্ণতমা মহাশক্তির স্বরূপ বা স্বভাব। "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"—বিনা প্রেমে এই পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় না। * * প্রথমে গুরূপদিষ্ট কর্ম্মকেই অবলম্বন করিতে হয়। নতুবা প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই। ক্রমশঃ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়া কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান

হইতে ভক্তির বিকাশ হয়, এবং ভক্তি পরিপক্ক হইয়া প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব এবং তাহার পরে বার্দ্ধক্য যেমন স্বভাবের নিয়মেই উদিত হয়,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমও তেমনিই পর পর ফুটিয়া উঠে। বীজ বপন না করিয়া ফল লাভের আশা, বন্ধ্যার পুত্র মুখ দর্শনের আশা আর কর্ম্মহীনের জ্ঞানলাভ কিংবা জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। * *

জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। তাহাতে স্বার্থানুসন্ধান অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তাহা অহংকার মুলক। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জড় সম্বন্ধ বা দেহাধ্যাস বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সে অবস্থার ভক্তি এক জাতীয় প্রার্থনা মাত্র। তাহাতে ফলের দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া পারে না। জ্ঞান ভিন্ন যে মুক্তি নাই ইহা ঠিক। তবে উহা শুষ্ক জ্ঞান নহে, যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান। অতএব মুক্তির পূর্ব্বে পরাভক্তির উদয়ই হইতে পারে না। যখন পাপ-পুণ্য বিগলিত হয়, সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়, জড়ীয় অভাব ও ত্রিতাপ জ্বালা নিবৃত্ত হয়, তখনই কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে অহেতুক ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান বল আর ভক্তিই বল, যোগাশ্রয় ভিন্ন কিছুই ঠিক ঠিক ভাবে হইবার উপায় নাই।

পূজা—পূজা ত' একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। উদ্দেশ্যটা হইতেছে একটা অবস্থা বিশেষের প্রাপ্তি। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঐরূপ পূজার প্রয়োজন থাকে না। সেই অবস্থা

পূজা ছাড়া হয় না বলিয়া, যতদিন তাহা প্রাপ্ত হওয়া না যায়—ততদিন পূজার অবশ্য প্রয়োজন থাকে। পূজার দ্বারাই পূজার পরের অবস্থায় যাইতে হয়। পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ নাই। কেহ কেহ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ইত্যাদি বশে বাল্যকাল হইতেই ফুল ইত্যাদি দিয়া ঠাকুর পূজা করে। মন্ত্র জানে না, তবু পূজা করে। কেহ কেহ একটু বয়স হইলে দীক্ষার পরে বা পূর্ব্বেও পূজা করিতে আরম্ভ করে।

বাসনা—আকাঙ্খা বাড়াইও না সেটা কষ্টের, দুঃখের কারণ। পুকুরের পরিসর যতই বাড়াইবে, জল ততই বাড়িতে থাকিবে। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। পরের পিছু মুখ চুলকান ভাল নয়। যে যাহাই করুক না কেন, তুমি তোমার অবস্থা বুঝিয়া চলিবে; তাহাতে কোনও লজ্জা বা কষ্ট নাই। অভাব ত' আমরা সৃষ্টি করি। অভাব বাড়াইয়া সেই অভাব দূর করিবার কি দরকার, বাপু! যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে। আর কর্ম্মের দরুণ—ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি আসে। তবে নিষ্কাম কর্ম্মই ভাল—তাহাতে অশান্তি হয় না। স্থূলত্ব কাটিয়া গেলে, কর্ম্ম আপনিই নিবৃত্ত হয়। যথাবিধি 'কর্ম্ম' করিলেই, নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্ঞানের উদয়ে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়। 'ধর্ম্মহীন' ব্যক্তির কর্ম্ম সংন্যাস অসম্ভব। * * * যে প্রণালীতে স্থূলভাব কাটিয়া যায়, তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাসনা ত্যাগের আর অন্য কোনও প্রণালী নাই। স্থূলের দাহ

এবং বাসনা ক্ষয় অভিন্ন ব্যাপার। বাসনা যুক্ত মনঃ স্থূল বই আর কি ?

ব্রহ্মপথ—মধ্যপথই ত' ব্রহ্মপথ। অন্য পথ কুপথ—বিষয়মার্গ। মধ্যপথে শক্তির স্রোত উজানে বহিতে থাকে। যে সকল শক্তি ইন্দ্রিয়াদির পথে এখন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, চিৎশক্তির প্রবোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সব একাগ্র হইয়া, পুঞ্জীভূত হইয়া, চিৎ-প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়া আপন-হারা হয়। হোমাগ্নি যেমন সমিদাহরণে সমিদ্ধ হয়—বর্দ্ধিত হয়, দেহমধ্যস্থ চিদ্‌বহ্নি ও প্রজ্জ্বলিত হইলে ও ইন্দ্রিয়াদির আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হইলে তেমনি প্রবলাকার ধারণ করে। উহা ঊর্দ্ধস্রোতে চলিতে চলিতে অনন্ত চিৎ-সাগরে যাইয়া আত্ম-সমর্পণ করে। ইহাই চিন্ময়ী জীব-ধারার—জাগ্রত কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সমুদ্রে বিলীন হওয়া।

মধ্যপথে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজঃ খেলে—দক্ষিণ ও বাম মার্গে বিষয় স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মতেজ ভিতরের দিকে চলে, বিষয় স্রোতঃ বাহিরের দিকে চলে; একটি ঊর্দ্ধাকর্ষণ, অপরটি মাধ্যাকর্ষণ বা অধঃকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট নীচ-ভাবাপন্ন জীবকে এই ঊর্দ্ধ স্রোতে যুক্ত করিয়া দেওয়াই গুরুর কার্য্য। স্রোতের কার্য্য স্রোতই করিবে—তাহা স্বাভাবিক। গুরু শুধু স্বভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া দেন।

বিবেক—বিবেকের অর্থ বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্য তীব্র হওয়া আবশ্যক। বৈরাগ্য দ্বারা হয় ছাড়া, ও নির্ভর দ্বারা হয় ধরা।

বিবাহ সংস্কার—সংসারে থাকিতে হইলে বিবাহের প্রয়োজন হয়, কারণ সকল রিপুকে সকল সময় ঠিক রাখা বড়ই শক্ত, তাহাতে আবার মায়ার প্রলোভন। অবশ্য যোগীর কথা আলাহিদা; তাহা হইলেও তাঁহারা দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। গুরুজনের আজ্ঞা পালন করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা কোনও বিষয়ে কষ্ট পাইলে বড়ই তাপ ভোগ করিতে হয়। * * *

যোগীর সাধনার মূল কেন্দ্রস্থল, এই সংসার। যে সংসারে এত আরামের মধ্যে থেকেও যোগাভ্যাস ক'রতে না পারে, সে বনে গিয়া কঠোরতার মধ্যে কি ক'রে পারবে? ভগবানের উদ্দেশ্য যদি এই হ'তো যে, সকল লোকই বাল্মীকির মত উইয়ের ঢিপি হ'য়ে ব'সে থাকবে, তা হ'লে জগতে এত জিনিষ দিবার কি দরকার ছিল? সব মানুষগুলো এক একটি ঢিপি হ'য়ে বসে থাকত। সংসারে সব জিনিষের মধ্যে (প্রলোভনের মধ্যে) থেকে, নিজের উন্নতির চেষ্টা করাই—তাঁহার উদ্দেশ্য।

* * * প্রকৃতিকে যে যে ভাবে নেবে, তার ফল সেই রকম পাবে। নারীর মধ্যে কোনও দোষ নাই—প্রকৃতি ত' সুধার আধার! মদের বোতল কি কখনও মাতাল হয়? জগতে সকলেই ঐ সংসারের মধ্যে থেকে, সকল কাজ ক'রে এসেছে।

ভগবান—ভগবান্ প্রকৃতি কি পুরুষ—এইটী স্থির করিবার জন্য মারামারি করিলাম! প্রকৃত পক্ষে তিনি পুরুষও নন্, প্রকৃতিও নন্। * * ভগবান যে একই কালে অরূপ ও রূপবান, নিরাকার ও সাকার,—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অবশ্য এই রূপের কথা শুনিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভৌতিক রূপের কথা মনে করা উচিত নহে। সাধারণতঃ যোগী ও ভক্তগণও তাঁহার এই পরমরূপের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরম-রূপ বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু, ভগবান স্বয়ং তাঁহার ভ্রান্তি অপলোদন করিয়াছিলেন। * * * ভগবান যে উপাদানে প্রস্তুত উহাও বিজ্ঞান দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান প্রস্তুত হইয়াছেন—সেই মহাশক্তি হইতে। এই মহাশক্তিকে কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ নারায়ণী বলিয়া থাকে। তাঁহারই খেলা চলিতেছে। পুরুষের নিজের কোনও শক্তি নাই—প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে।

ভক্তি—কর্ম্ম (গুরুদত্ত সাধন) করিতে করিতে চিত্তের মল কাটিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের পরিপক্বতায় ভক্তি সঞ্জাত হয়। ভক্তির মধ্যে গোড়ার দিকে একটা উচ্ছ্বাস বা মাদকতা থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রশম হয়। তখন ভক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে। উন্মাদিনী ভক্তিতে ভগবানকে লাভ করা যায় না। আবার উহার যে কোনও উপকারিতা নাই, এ কথাও বলা যায় না। উহা দৃঢ় হইলে ভগবানের দর্শন পর্য্যন্তও হইতে পারে। * * ভগবানের আরাধনায় সংজ্ঞাহীন হইয়া যাওয়াটা কিছু নয়। উহাতে বুঝিতে হইবে, আসলে কিছু নাই। বরাবর জ্ঞানে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা

করিবে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া পরম আনন্দ পাইবে—ইহাই যোগের অবস্থা।

জ্ঞানের পরে ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই একদিকে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অপর দিকে অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনাত্মা বা জড় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়, আর পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ হয়। ইহাই ভক্তি। চিন্ময় অবস্থার উন্মেষ না হইলে, জড়ত্বের বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ না হইলে, শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হওয়ার পরেই বিশুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন অন্য আকাঙ্ক্ষা ত' দূরের কথা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না। কর্ম্ম অন্বেষণ, জ্ঞান প্রাপ্তি, ভক্তি আস্বাদন। অতএব জ্ঞানেরই পরিপক্ক অবস্থা ভক্তি।

ভালবাসা (বৈষয়িক)—তোমরা মনে কর স্ত্রীর ভালবাসাই আসল ভালবাসা। তা' নয়, তাতে কাম আছে। সংসারের সকল ভালবাসাতেই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা এক মায়ে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এ সব আমি ফোকাস্ ক'রে দেখিয়ে দিতে পারি।

মহাশক্তি—এক মহাশক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় আর নাই। মহাশক্তির শক্তির বিষয় যিনি বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন, তিনিই সদ্‌গুরু। মানুষ কখনই 'ভগবান হইতে পারে না।' তোমরা বালক, সেইজন্য সামান্য বিষয় লইয়া উতলা হও। যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়া পূর্ণজ্ঞানের

অধিকারী হইতে পারিবে। জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমায় উপনীত হইলে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকিবে না। এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে, বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লাগে। * * * মহাশক্তিই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত, সেইরূপ তোমায়-আমায় প্রভেদ নাই। কার্য্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। অশান্তি থাকিবে না, থাকিতে পারে না।

মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ। মা-চিন্তারূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে। অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়; ইন্দ্রিয় সকলের দুষ্ট বন্ধন সকল ছিন্ন হয় এবং মর্ম্ম-প্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থি সকল আলগা হইয়া যায়। যথাবিধি কার্য্য না করিলে মহাশক্তি মায়ের ঠিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। 'ক্রিয়া' অবস্থায় যোগীর বিশেষ পরীক্ষার স্থল। সম্মুখে যতই কেন প্রলোভন আসুক না, বিশ্বাসের প্রচণ্ড তেজে চুরমার হইয়া যাইবেই যাইবে। জীব-জড়িত মায়ের খেলা বড় মজার ও মধুর। জগৎময় এক মহামায়ের মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে, অথচ নানা দ্রব্য ও জীব বিশেষে শক্তি ভাব ক্রিয়াদির নিয়ম আলাদা; তাহাও খণ্ডন করা যায় না। অসীম ইচ্ছার নিয়ম কেমন সুন্দর! এ সব দেখিয়াও মানুষ তাহার বিষয়ে অন্ধ হ'য়ে ঠিক গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া, পাশবৃত্তির অধীন হইয়া এতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। * * *

করিবে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া পরম আনন্দ পাইবে—ইহাই যোগের অবস্থা।

জ্ঞানের পরে ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই একদিকে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অপর দিকে অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনাত্মা বা জড় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়, আর পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ হয়। ইহাই ভক্তি। চিন্ময় অবস্থার উন্মেষ না হইলে, জড়ত্বের বিষয়ের আবরণ ভঙ্গ না হইলে, শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হওয়ার পরেই বিশুদ্ধ ভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন অন্য আকাঙ্ক্ষা ত' দূরের কথা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না। কর্ম্ম অন্বেষণ, জ্ঞান প্রাপ্তি, ভক্তি আস্বাদন। অতএব জ্ঞানেরই পরিপক্ক অবস্থা ভক্তি।

ভালবাসা (বৈষয়িক)—তোমরা মনে কর স্ত্রীর ভালবাসাই আসল ভালবাসা। তা' নয়, তাতে কাম আছে। সংসারের সকল ভালবাসাতেই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা এক মায়ে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এ সব আমি ফোকাস্ ক'রে দেখিয়ে দিতে পারি।

মহাশক্তি—এক মহাশক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় আর নাই। মহাশক্তির শক্তির বিষয় যিনি বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন, তিনিই সদ্‌গুরু। মানুষ কখনই 'ভগবান হইতে পারে না।' তোমরা বালক, সেইজন্য সামান্য বিষয় লইয়া উতলা হও। যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়া পূর্ণজ্ঞানের

অধিকারী হইতে পারিবে। জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমায় উপনীত হইলে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকিবে না। এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে, বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লাগে। * * * মহাশক্তিই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত, সেইরূপ তোমায়-আমায় প্রভেদ নাই। কার্য্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। অশান্তি থাকিবে না, থাকিতে পারে না।

মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ। মা-চিন্তারূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে। অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়; ইন্দ্রিয় সকলের দুষ্ট বন্ধন সকল ছিন্ন হয় এবং মর্ম্ম-প্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থি সকল আলগা হইয়া যায়। যথাবিধি কার্য্য না করিলে মহাশক্তি মায়ের ঠিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। 'ক্রিয়া' অবস্থায় যোগীর বিশেষ পরীক্ষার স্থল। সম্মুখে যতই কেন প্রলোভন আসুক না, বিশ্বাসের প্রচণ্ড তেজে চুরমার হইয়া যাইবেই যাইবে। জীব-জড়িত মায়ের খেলা বড় মজার ও মধুর। জগৎময় এক মহামায়ের মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে, অথচ নানা দ্রব্য ও জীব বিশেষে শক্তি ভাব ক্রিয়াদির নিয়ম আলাদা; তাহাও খণ্ডন করা যায় না। অসীম ইচ্ছার নিয়ম কেমন সুন্দর! এ সব দেখিয়াও মানুষ তাহার বিষয়ে অন্ধ হ'য়ে ঠিক গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া, পাশববৃত্তির অধীন হইয়া এতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! * * *

সকল শক্তির মূল যে শক্তি, তিনিই প্রথম ও শেষ। সকল বিষয়ে তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি শক্তি সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ, এবং বিচিত্র জগৎ, সকল দেব-দেবী যাহা কিছু আছে, তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না; আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী, দ্বৈতাদ্বৈত, নিত্য-অনিত্য লীলার সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ, পিতা-পুত্র, সেব্য-সেবক প্রভৃতি লইয়া মজার খেলা খেলিতেছেন।—প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন। আর, যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সে কিছু কিছু জানে। যুক্তি-তর্কে ত' কিছু পাওয়া যায় না; প্রত্যক্ষ জিনিষে আবার যুক্তি-তর্ক কি? *** মহাভাব তত্ত্বের সারমর্ম্ম 'ক্রিয়ার' দ্বারা সর্ব্বদাই হৃদয়ে গ্রহণ কর। বাহ্যিক ভাবের ভিতর টলিয়া না পড়িয়া, সর্ব্বদাই মা-কে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও। তাহা হইলেই সব হইবে।

মনুষ্য-জন্ম ও পশুজন্ম (বলিদান)—শাস্ত্রে আছে মানুষ চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম, কেন না মোক্ষ কেবল এই জন্মেই কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায়। এই হিসাবে দেব-জন্ম হইতেও মনুষ্য-জন্ম শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জন্মের পূর্ব্বে স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি বিভিন্ন যোনিতে জীবের যে জন্ম তাহা কর্ম্ম জন্য নহে, মনুষ্য জন্মের পূর্ব্বে কর্ম্মের অধিকার হয় না। তাহার পুর্ব্বে যে চুরাশি লক্ষ জন্ম, স্বভাবের নিয়মেই জীবকে তাহার মধ্য দিয়া আসিতে হয়। কোনও জীবকে এই জন্ম প্রবাহ হইতে মুক্ত করা অন্য উপায়ে কাহারও সাধ্য নয়; কেবল শাস্ত্র বিধি অনুসারে বলি দিলেই পশুর

পশুত্ব চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যায়। বলি দেওয়া হয় কোনও দেবতার মূর্ত্তির সম্মুখে বা পীঠস্থানে। যে মুর্ত্তির সম্মুখে বলি দেওয়া হয়, শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায়, তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া লওয়া হয়। জীব মাত্রেরই একটি লিঙ্গদেহ আছে, সমস্ত বস্তুরই লিঙ্গদেহ অথবা সুক্ষ্ম সত্তা একটি আছে। দেব মূর্ত্তির পশ্চাতে যে বিরাট সূক্ষ্ম সত্তা আছে, তাহা বলির পশুর লিঙ্গ-দেহকে স্বীয় প্রবল আকর্ষণ বলে আপনাতে টানিয়া নেয়।—ফলে পশুর পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব লাভ হয়।

বধ করিতে পশুকে সাময়িক যে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা পাপ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তবে বলিসহ পূজা দিলে যে পুণ্য হয় তাহা অনেক গুণ অধিক। যজমানকে অধিক পুণ্যের সহিত স্বল্পমাত্র পাপের ফলও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতে উচ্চাঙ্গের পূজাও আছে, যাহাতে শক্তিশালী যজমান পশুর বলিদান কালীন কষ্ট নিজে টানিয়া নেন। এইজন্য অথর্ব্ববেদে বলা হইয়াছে, বলি হিংসা নহে।

পশুবলি তিন যুগ হইতেই আছে। উহা শাস্ত্রেরই নির্দ্দেশ। শাস্ত্র কখনও নিন্দনীয় কার্য্য করিতে বলে না। জীবন ধারণ করিতে গেলে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় হিংসা করিতেই হয়। উহা অপরিহার্য্য। শাক-সব্জী খাইয়া থাকিলেও হিংসা একেবারে বর্জ্জন করা যায় না।

মহাপুরুষের ও যোগীর বাহ্য-লক্ষণ—বাহ্য-লক্ষণ দ্বারাও মহাপুরুষকে চেনা যায়। যে জানে সে অবশ্যই তাহা

পারে। তবে তাহাও সহজ নহে। যিনি মহাপুরুষ, তিনি যদি আত্ম-পরিচয় দিতে ইচ্ছা না করেন, যদি তিনি ধরা দিতে না চান, তবে কাহার সাধ্য তাঁহাকে লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া লয়? তিনি অলক্ষ্য বস্তু—নিজের উপাধি সঙ্কোচ করিলে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। আর তিনি যদি নিজে ধরা দেন, তবে যে ভাবে আবির্ভূত হইলে জীব ধরিতে পারিবে, সেই ভাবেই আবির্ভূত হন্। লক্ষণ জানা না থাকিলেও, জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

আসল কথা—কৌশল বা বলপুর্ব্বক মহাপুরুষকে বুঝিবার চেষ্টা করা বাতুলের প্রয়াস মাত্র। যদি তাহা পারা যাইত, তাহা হইলে মহাপুরুষ বা অবতারদিগকে সকলেই সমভাবে চিনিতে পারিত। মতভেদ পরিলক্ষিত হইত না।

মহাপুরুষগণ বালকের ন্যায়, জড়বৎ, উন্মত্তবৎ ও পিশাচবৎ আচরণ করেন। বাহ্যভাবের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যাহা মহাপুরুষ মাত্রের নিত্য ও সামান্য-রূপ ও যাহা সদা প্রকাশমান তাহা সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। যে অজ্ঞানী, সে মহাপুরুষকে চিনিবে কি প্রকারে? সে ত' নিজেকেই চিনিতে পারে না। যদি শক্তিশালী পুরুষ গুপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোন লক্ষণই তাঁহার অঙ্গে প্রকট হইবে না। ব্যবহার বা আচারে তাঁহারা বদ্ধ নহেন। তাঁহাদেব কোন নির্দ্দিষ্ট আচরণ নাই—বস্তুতঃ তাঁহারা বিধি নিষেধের অধীন নহেন; তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী,

লীলাময়। তাঁহাদের খেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বরূপ দর্শন করা সহজ কথা নহে। তবে যখন তাঁহারা তটস্থ থাকেন, অর্থাৎ কাহারও প্রতি অনুকুল বা প্রতিকুল ভাব-বিশিষ্ট না থাকেন—তখন লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় বটে। এই লক্ষণ যে শুধু স্থূলদেহ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে—স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ সকল দেহেই প্রযোজ্য। তবে, সাধারণ লোকের পক্ষে স্থূলের অতীত বস্তু অতীন্দ্রিয় বলিয়া, তৎসম্বন্ধে কোন লক্ষণ কার্য্য সাধক হয় না। অবশ্য, সাধন বলে আপন সত্তার বিকাশ হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ও বিশুদ্ধতর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ও তদনুসারে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করা যায়।

যাঁহারা ইচ্ছামাত্র অন্যের লিঙ্গ শরীর দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা লিঙ্গদেহের বর্ণ, গতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে উক্ত লিঙ্গাভিমানী জীবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বুঝিতে পারেন। যাহা কিছু জানা আবশ্যক, সব উহা হইতেই জানিতে পারেন। কিন্তু মহাপুরুষগণ লিঙ্গাতীত—কারণ, তাঁহারা মুক্ত। সুতরাং যাঁহাদের কারণদেহ বা মহাকারণ দেহ পর্য্যন্ত দেখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাই স্বয়ং লিঙ্গাতীত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে সমর্থ। কিন্তু, সাধারণ জীব স্থূল দর্শনের অগোচর কোন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেইজন্য উক্ত অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বস্তু জ্ঞান করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই স্থূল লক্ষণ দ্বারা জানিবার চেষ্টা।

তপস্যা করিলে দেহের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। যাঁহার ভূত শুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার স্থূলদেহ হইলেও অন্যান্য লোকের দেহের ন্যায় নহে। বার বার সঙ্গ করিতে হয়—দীর্ঘকাল সঙ্গে থাকিলে বহু অলৌকিক লক্ষণ ঐ দেহে দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহার কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়াছে, যিনি সিদ্ধি এবং যোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। এইজন্য ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারা, একখানা ফটোগ্রাফ হইতেও কাহারও যোগ-সিদ্ধি হইয়াছে কিনা, তাহা জানিতে পারা যায়। যোগী, রোগী, ও ভোগী শুধু চক্ষুর চাহনি হইতেই ধরা পড়ে। যোগীদের ললাটেরও পরিবর্ত্তন হয়। তা'ছাড়া যাঁহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে ও সুষুম্না-পথ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা পদ্মগন্ধ খেলে, তাঁহার নিশ্বাসে পদ্মগন্ধ বহিতে থাকে, তাঁহার নাভির নিকটে কোন পাত্র রাখিয়া উপর হইতে জল ঢালিলে ঐ জল নাভি স্পর্শে পদ্মের সুগন্ধি আতরের ন্যায় হইয়া পাত্রে সঞ্চিত হয়। যোগীদিগের ব্যবহার কালেও নাসিকাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না—নাভিপথে ও রোম-কূপের পথে চলে। শুধু তাহাই নহে—তাঁহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বায়ু গ্রহণ করেন না। বাহ্য বায়ু যখন তাঁহারা গ্রহণ করেন, তখন উহা নাভি-পথে নির্ম্মল ভাবেই গৃহীত হয়—মলাংশ বাহিরে পড়িয়া থাকে। ঐ বায়ু দীর্ঘকাল শরীরের মধ্যে ধরা থাকে—ভিতরে ভিতরেই উহা সঞ্চারণ করিতে থাকে। এইজন্যই যোগিগণ বাহ্য ভাবে অভিভূত হন না। চিত্তে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির উদয় হয়, কাম-ক্রোধাদি ভাবের সঞ্চার হয়—সবই বাহ্য

বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফল। যিনি বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্বন্ধ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব ও একাগ্রতা কিছুতেই নষ্ট হয় না—বহির্জগতের সহিত ব্যবহার করিয়াও তিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না। বহিঃ স্রোত তাঁহার অন্তরে প্রবেশ পথ পায় না। * * *

যিনি যোগী, তাঁহার দেহ সিদ্ধদেহ। তিনি ইচ্ছামাত্রই নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারেন,—এমন কি পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া অদৃশ্য হইতে পারেন—আবার প্রসারণ করিয়া বিরাট আকারে পরিণত করিতে পারেন। ইহাকেই 'অণিমা' ও 'মহিমা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। শুধু দেহ কেন, দেহের যে কোন অবয়বকে, কিংবা বাহ্য বস্তুকেও তিনি ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ করিতে পারেন। দেহকে ইচ্ছানুরূপ হাল্কা ও ভারী করাও তাঁহার আয়ত্তাধীন। তিনি দেহকে কর্দ্দম-পিণ্ডের ন্যায় পিণ্ডীভূত করিতে পারেন, অথবা সন্ধি-সকলকে শিথিল করিয়া প্রত্যেকটি অংশকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারেন। নাভিরন্ধ্র অথবা রোমকূপ দ্বারা বাহিরের যে কোনও পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে ঢুকাইতে পারেন। সে পদার্থ যত বড় বা যে পরিমাণ হউক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তিনি এক দেহকে বহু প্রকারের বা একই প্রকারের বহু দেহে বিভক্ত করিয়া, এক বা বহুস্থানে যুগপৎ প্রকাশিত করিতে পারেন। প্রাচীর বা অন্য কোন কঠিন আবরণের ভিতর দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে, যোগীর দেহ প্রতিহত হয় না। তাঁহার

দেহে এত অধিক পরিমাণে তড়িত-শক্তি সঞ্চিত থাকে যে, হিংস্র ভাব লইয়া যে কোন জীব তাহা স্পর্শ করিতে যাইবে, মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।—ইহা যে তাঁহার ইচ্ছাতে হয়, তাহা নহে, স্বভাবতই হইয়া থাকে। বিষধর সর্পের উগ্র বিষও যোগিদেহে বিষ ক্রিয়া করিতে পারে না—দৈহিক তেজের সংঘর্ষে উহা ভস্ম হইয়া যায়, ও দংশনকারি সর্পাদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উচ্চ-স্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে যোগি-দেহ ভূমিস্পর্শ করে না—কারণ দেহে ঊর্দ্ধগতিশীল নির্ম্মল বায়ু সঞ্চিত থাকে বলিয়া পড়িবার সময় উহা বিক্ষুব্ধ হইবা মাত্র দেহ আপনিই শূন্যপথে উপর দিকে উঠিতে থাকে।

যোগীর নেত্রে এত তেজঃ সঞ্চয় হয় যে, তিনি তীব্র ভাবে কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—এমন কি অতি কঠিন প্রস্তর বা লৌহ পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ছোট ছোট বালক-বালিকা যাহারা অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য যোগীর নয়নে তাকাইলে নানা প্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পায়। একটু গভীর ভাবে নিবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যোগীর দেহ হইতে জ্যোতির ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে—দেহ প্রভায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হইয়া পড়ে। এইরূপ কত যে যোগীর বাহ্য লক্ষণ আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যোগী নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও মধুর প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এই সকল লক্ষণ দ্বারা

সাধারণ লোকের পক্ষে মহাপুরুষকে চিনিবার সহায়তা হয়। আসল কথা, নিজের দৃষ্টি-শক্তির বিকাশ অথবা হৃদয়ের সত্য ব্যাকুলতাই, মহাপুরুষকে ধরিবার প্রধান উপায়।

মনঃ—"মন" অর্থে একটি শুদ্ধ সত্ত্ব। ভগবতীর লীলা মানুষ দর্শন করে 'মন' দিয়া। পঞ্চভূতের যাহা সার, তাহা দিয়া মানুষের স্থূলদেহ হয়। ইহার উপরে আছে 'সূক্ষ্মদেহ।' তার উপর 'কারণদেহ'। স্থূলের মধ্য দিয়া অবিরত বৃত্তি হয় বলিয়া 'মন' স্থূলে বদ্ধ থাকে, যেমন খাঁচার ভিতরে পাখী। এই খাঁচা ভাঙ্গার উপায় হইতেছে—'ক্রিয়া' (যোগ)। স্থূল হইতে মন সূক্ষ্মে যায়। তাহা হইতে 'কারণে' যায়।

দেহ, মন ও আত্মা—এই তিন লইয়াই মানব। যখন সে দেহ ভূমিতে—তখন সে পশুর স্তরে থাকে। যখন সে মনঃ ভূমিতে, তখন সে মননশীল মানব। আর, যখন সে আত্ম-ভূমিতে বিরাজ করে—তখনই মানব হয় দেবতা।

মন্দ-কার্য্য—সবই নিজের কর্ম্মের ফল, সেই কর্ম্ম আর বাড়াইও না। কেবল দুঃখটুকুই দেখ, কিন্তু কত রাশি রাশি দুষ্কৃতির ভোগ ঐ দুঃখটুকুতেই কাটিয়া যাইতেছে—তাহা ত' দেখ না। দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, আর নূতন কষ্টের সৃষ্টি হইবে না। হাঁ, মনের ধর্ম্মে সময় সময় দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবে বই কি? কিন্তু মনের বলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দমন করা উচিত, তাহাকে প্রশ্রয় দিলেই সে বিপদ ঘটাইবে। * * * যে কাজটা

সকলের সামনে ক'রাতে লজ্জাবোধ হয়, তাহাই খারাপ! আমরা কি জানি না যে কোন্ কাজটা খারাপ? কিন্তু জেনে-শুনেও নিয়ত খারাপ কাজই ত' ক'রছি। নিজের খারাপ কাজকে সমর্থন করবার জন্য মানুষ নিজের বুদ্ধিতে কত রকমেই না যুক্তির দ্বারা বুঝাতে বা বুঝতে চেষ্টা ক'রে থাকে।

যুক্ত-অবস্থা —সুষুম্না নাড়ীর পথ খুলিয়া গেলে যোগী সর্ব্বদা যুক্ত অবস্থাতেই থাকেন। তোমাদের সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা বলি বা বাহ্য বিষয়ে চিন্তা করি তখনও সুষুম্না পথ খোলাই থাকে—যুক্তাবস্থার ব্যতিক্রম হয় না। এ সকল বাহিরের আবরণের ব্যাপার। ক্রিয়ায় বসিলে সকল আবরণ মুক্ত করিয়া লই। তখন অন্যের দেখা নিষিদ্ধ, কারণ সেই সময় সমস্ত খুলিয়া লওয়া হয়। কারণ কেহ দেখিলে, তাহার অনিষ্ট হইতে পারে। দেহেরও পরিবর্ত্তন কিছু হয়। বর্ণ সাদা হয়— আরও কিছু হয়।

প্রকৃত যোগী সদাই জাগরূক বা প্রকাশমান। তাঁহার স্থূল শরীর, লিঙ্গশরীর এবং কারণ-শরীর চিন্ময় সিদ্ধ শরীর রূপে পরিণত হয়। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত সদাই যোগ-যুক্ত থাকেন বলিয়া, ইচ্ছামাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইতে পারেন।

মুক্তি—আবরণ নিবৃত্তি মুক্তির নামান্তর। যে আবরণে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্থূল ভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট থাকে, যখন সেই

আবরণ অপগত হইবে, তখন সে সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে, অর্থাৎ সে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সকল পদার্থেরই সূক্ষ্মাবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে। স্থূল ভাবের নির্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়া প্রিয়-বোধ জাগে, অথবা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। স্থূল সংবন্ধ না থাকিলে সুখ-দুঃখ বোধ, বা যাহাকে প্রচলিত ভাষায় 'ভোগ' বলে, তাহা থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থাতেও স্বভাবের স্ফুরণ হয় না। তখনও অভাব থাকে—অবশ্য সে অভাব এই পৃথিবীর মতন নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাই একমাত্র অভাব তাহা নহে—তাহা বিশেষ ভাবে না থাকিলেও অন্য জাতীয় অভাব থাকে।—এই স্তর ভেদ করিয়া উঠিলে পরমানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। একটা নিবিড় ও গভীর আনন্দ ভিন্ন এখানে আর কিছুই অনুভব পাওয়া যায় না। * * * জীব মাত্রই বিকারগ্রস্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। বিকার কাটাইয়া যখন স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে, তখন আর কোনও প্রকার অশান্তি থাকিবে না। ইহাই ত' সকলে চায়।

কেহ অল্প বয়সেও বৈরাগ্যবান্ হয়, কেহ বৃদ্ধ বয়সেও বিষয়-তৃষ্ণা ছাড়িতে পারে না। ঐ বৈরাগী বয়সে বালক হইলেও বস্তুতঃ বৃদ্ধ, কারণ সে প্রবৃত্তি চক্র ছাড়িয়া নিবৃত্তি মুখে আসিয়াছে, আর ঐ বিষয় লোলুপ বৃদ্ধ এখনও বালক, কারণ এখনও তাঁহার বিষয় তৃষ্ণা মিটে নাই, এখনও তাঁহার নিবৃত্তি পথে আসিবার উপযুক্ত ক্লান্তি আসে নাই। ঐ বৃদ্ধ এখনও দীর্ঘকাল সংসারে ভ্রমণ করিবেন। এখনও বহু অতৃপ্ত

আকাঙ্ক্ষার তর্পণ তাঁহার বাকী আছে।—অতৃপ্তি ও ঋণ লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

মোক্ষ—ইহার অর্থ মায়ার আবরণের অপসারণ। মোক্ষ না হইলে স্বভাবের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না, কাজেই উহা পরম পুরুষার্থ নয়, তাহার দ্বার মাত্র। মোক্ষ অর্থে অনেকে নির্ব্বাণ বুঝেন। এই মতে জীব ব্রহ্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়; তাহার আর ব্যক্তিত্ব থাকে না, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ, মহাকাশের সঙ্গে মিলিয়া যায়—সেইরূপ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ঘট ভাঙ্গিলেও, ঘটের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। সে স্বাভ্যন্তরস্থ আকাশসহ অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়—পরমাণুরূপে থাকে। প্রবলশক্তির কাছে তুর্ব্বল শক্তি স্বভাবতঃ আত্মহারা হইয়া পড়ে; সেইজন্য ব্রহ্মসত্তার বা ঈশ্বর সত্তার সম্মুখীন হইলে জীবসত্তা আত্মবোধশূন্য হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবোধশূন্য হইলেও তাহার জীবত্ব লুপ্ত হয় না।—এইটি মহাসুখের অবস্থা হইলেও এই নির্ব্বাণ যোগীর কাম্য নহে। ব্রহ্মসত্তা বা ঈশ্বর সত্তার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে যাইতে হয়, কিন্তু পাছে সেই ব্যূহে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুর দশা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেই ভয়ে তিনি প্রবেশের পূর্ব্বে নির্গমের সামর্থ্য করিয়া যান। সেই সামর্থ্য বলে তিনি ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব ভেদ করিয়া নিত্যধামে আদিজননীর ক্রোড়ে বসিয়া সকল লীলা আস্বাদন করেন।—ইহাই যোগীর গতি—তাঁহার পরম পুরুষার্থ। ** মোক্ষের জন্য 'কর্ম্ম' দরকার।

মন্ত্র কাহাকে বলে ও উহার আবশ্যকতা কেন ?

রজঃ ও তমোগুণের আধিপত্য হইতে গুরু-শিষ্যের মনকে ত্রাণ করিবার কৌশলকেই মন্ত্র বলে। মনের জড়তা নাশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করাই 'মন্ত্রের কার্য্য।' যে কোন উপায়েই মনকে চেতন করিতে চেষ্টা কর, মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে! কারণ, ব্রহ্মপদ বা সুষুম্না মার্গ না খুলিতে পারিলে কোন উপায়ই ফলদান করে না।

'মন্ত্র' ও দেবতায় কোন পার্থক্য নাই। দেবতার স্বাভাবিক নামকেই, অর্থাৎ যে নাম ধরিয়া ডাকিলে দেবতার আবির্ভাব বা অন্য প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলে। নাম না জানা থাকিলে অনন্ত সত্তার গর্ভ হইতে নিজের ইষ্টমূর্ত্তিকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। নামের সহিত রূপের নিত্য সম্বন্ধ। 'নাম'কে আশ্রয় করিলে রূপের প্রকাশ আপনিই হইয়া থাকে। দেবতা বাচ্য, মন্ত্র তাহার বাচক, উভয়ের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ।

গুরু মন্ত্রই দেন। কিন্তু, 'মন্ত্র ত অক্ষয় সমষ্টি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উহা হইতে বিবেকশীল বিচারবান্ জীবের পক্ষে কোনই সুফলের আশা ছিল না। বস্তুতঃ, 'মন্ত্র' চৈতন্য স্বরূপ— চিৎ-শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। উহা শব্দের আশ্রয়ে প্রকটিত হইলেও, স্বরূপতঃ জড় পদার্থ নহে। মন্ত্র যে কত বড় প্রবল শক্তি, তাহা যথাবিধি 'মন্ত্রে'র কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গুরু যখন শিষ্যের কর্ণমূলে মন্ত্র দান করেন, তখন বাস্তবিক পক্ষে শব্দ দ্বারা জ্ঞান বা চৈতন্য

শক্তিরই সঞ্চার করিয়া থাকেন, ইহাই দেবতার স্বরূপ। সদ্গুরু প্রদত্ত মন্ত্র শব্দ মাত্র নহে, উহা চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা দেবতার আত্মপ্রকাশ। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতির সমকালে শিষ্য হৃদয়ে সংক্রমণ করেন, সেইজন্য এই চেতন মন্ত্র বা সিদ্ধ মন্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই শিষ্যের অন্তঃকরণে দিব্য-চৈতন্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হইলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয় না। ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া তদনুসারে মনোময়ী মূর্ত্তি গঠন করা কল্পনার খেলা। ইহা প্রকৃত উপাসনার অঙ্গ নহে। মন্ত্র ও দেবতা যখন অভিন্ন, শুধু প্রকাশ কালের তারতম্য বশতঃ ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তখন মন্ত্রের সহিত সাধকের মনের সংঘর্ষ হইতে দেবতার মূর্ত্তি আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে, তজ্জন্য ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। মন্ত্র চৈতন্য না হইলে শুধু শব্দ হইতে এই প্রকারে জ্ঞানের বিকাশ সহজ সাধ্য নহে। নবীন সাধকের পক্ষে মন্ত্রকে চেতন করিয়া লইয়া তাহার আরাধনা করা অতি কঠিন। এইজন্য গুরুই বিচার পূর্ব্বক মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ বা সিদ্ধ করিয়া উহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক শিষ্যকে প্রদান করেন।

মন্ত্র ও 'বীজ'—বীজ 'নিরর্থক অক্ষর সমষ্টি মাত্র' নহে। 'বীজই' মূল-মন্ত্র। শাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল সবই সুন্দর বটে, কিন্তু বীজ না হইলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, এবং এই সকল সুন্দর বস্তু আপন সত্তা লাভ করিতে পারে না। দেব-তত্ত্বের বিচারেও 'বীজের' স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—বীজের মহত্ত্ব ও শক্তি অচিন্ত্য, অনন্ত

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীজ-মন্ত্র প্রভাবে দেবদেবী হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আমি একটি একটি করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে পারি। বীজ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, ইহার সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। 'বীজের' অর্থ নাই, কে বলিল? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার অর্থ নিরূপণে অপারগ, ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যায়,—ইহা হইতে প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে? বীজ গর্ভে যদি শক্তি থাকে. তবে তাহা ক্ষেত্রে পতিত হইলে যথাকালে অঙ্কুরাদি ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়। বৃক্ষের চিন্তা না করিলেও বৃক্ষের বীজ ভূমিতে পতিত হইলেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে—যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, সেই প্রকার 'বীজ'কে চেতন করিয়া, অর্থাৎ শক্তি সংযুক্ত করিয়া, তাহার সাধনা করিলে বীজ-মন্ত্র হইতে দেবতার আবির্ভাব হইবেই। দেবতার অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি ধ্যান করিয়া ফুটাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যবহার-ক্ষম সত্য পদার্থ। শুধু ছবি ধ্যান করিয়া ঐরূপ সত্য বস্তুর আবির্ভাব সহজে হয় না। যে দৃষ্টিতে তুমি, আমি ও জগৎ সত্য পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই দৃষ্টিতে দেবতাও সত্য।

মন্ত্র-শক্তি—মন্ত্রের কার্য্য হইতেছে, শক্তি ধারণ জন্য আধার প্রস্তুত করা। মন্ত্রসহকৃত 'ক্রিয়া' ও জপের উহাই লক্ষ্য! গুরুদত্ত মন্ত্র অর্থযুক্ত বা অর্থহীন শব্দ সমষ্টি রূপে প্রদত্ত হইলেও, উহা শক্তিময় বস্তু, অর্থাৎ স্বভাবতঃ শক্তি। শব্দগুলি ঐ শক্তির আবরণ মাত্র; শব্দাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই

'মন্ত্র'কে দেবতার দেহই বলা হয়। শব্দের অভ্যন্তরস্থ বস্তু দেবতাই। এইরূপে মন্ত্র ও দেবতা এক।

গুরুদত্ত মন্ত্র ঠিক ঠিক ভাবে জপ করিলে সংশয়, অবিশ্বাস ও ভয় থাকে না; সাহস হয়, দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। মনের সন্দেহ, সন্তাপ তুষ্টভাব ইত্যাদি আসিলে, দ্বিগুণ উদ্যমে জপ করিতে হইবে।

লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে মন্ত্র-চৈতন্য হয়। মন্ত্র-চৈতন্যের সূচনায় জ্যোতিঃ দর্শন হইতে থাকে। প্রথমতঃ মৌমাছি চাকের মত (সচ্ছিদ্র) জ্যোতিঃ দেখা যায়। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র চৈতন্যময় বস্তু।

মন্ত্র ও দেবতা-বিচার - সকল মনুষ্য সমান অধিকার সম্পন্ন নহে বলিয়াই দীক্ষার সময় এই দেবতা-বিচারের ব্যবস্থা। যদি সকলেরই অধিকার এক প্রকার হইত, তাহা হইলে অবশ্য বিচারের আবশ্যকতা হইত না। বিচারশীল আচার্য্য মনুষ্যের অধিকার ও যোগ্যতা বিচার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, তদনুসারে তাহার সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই অধিকার বিচার ঠিক ঠিক ভাবে হয় না বলিয়াই অনেক স্থলে সাধনায় প্রত্যক্ষ ফল অনুভবগম্য হয় না। * *

উপাদান-গত সাদৃশ্য বিচার করিয়া যেমন পতি ও পত্নীর পরস্পর সম্বন্ধ ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমনই উপাদান সাদৃশ্যের উপরই মন্ত্র ও দেবতার নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার উপাস্যও সেই প্রকার। কিন্তু কোনও ব্যক্তির স্বভাবের পরিচয় একমাত্র যোগ-দৃষ্টিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব দীক্ষা দান করিতে হইলে যোগের দ্বারা প্রকৃতি ও সংস্কারের বিচার অত্যাবশ্যক।

মন—ভগবতীর লীলা মানুষ দর্শন করে মন দিয়া। মন একটি শুদ্ধ সত্ত্ব। পঞ্চভূতের যাহা সার, তাহা দিয়া মানুষের স্থূলদেহ হয়। ইহার উপরে আছে সূক্ষ্মদেহ, তার উপরে কারণদেহ। স্থূলের মধ্য দিয়া অবিরত বৃত্তি হয় বলিয়া, মন স্থূলে বদ্ধ থাকে, যেমন খাঁচার ভিতরে পাখী। এই খাঁচা ভাঙ্গার উপায় হইতেছে—'ক্রিয়া' (যোগ)। স্থূল হইতে মন সূক্ষ্মে যায়, তাহা হইতে কারণে যায়।

মনের শুষ্কতা—'ক্রিয়া' ঠিক ভাবে আদেশ মত করিলে, ফল পাওয়া যাইবে। অশান্তি সমস্ত শান্তিতে পরিণত হইবে। কার্য্য না করিলে ফলের আশা কোথায়? চন্দন-কাষ্ঠ ঘাড়ে করিয়া বেড়াইলে সৌগন্ধ পাওয়া যায় না, জ্বালিতে হইবে। তিল দেখিয়া তৈলের অনুভব হয় না. উহাকে পেষণ করিলেই তৈল বাহির হয়। বৃথা সময় নষ্ট কেন কর?

মন্দ কার্য্য কি?—যে কাজটা সকলের সামনে করিতে লজ্জাবোধ হয়, তাহাই খারাপ। আমরা কি জানি না যে কোন কাজটা খারাপ? কিন্তু জেনে শুনে নিয়ত খারাপ কাজই করছি। নিজের খারাপ কাজকে সমর্থন করবার জন্য মানুষ নিজের বুদ্ধিকে কত রকমেই না যুক্তি দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা ক'রে থাকে।

মুক্তি ও মুক্তাবস্থা—আবরণ নিবৃত্তি মুক্তির নামান্তর। যে আবরণে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্থূলভাবে অভিনিবিষ্ট আছ, যখন

সেই আবরণ অপগত হইবে, তখন তুমি সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে, অর্থাৎ তুমি নিজেকে সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সকল পদার্থেরই সূক্ষ্মাবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে। স্থূলভাবের নির্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। ঋণ ও অতৃপ্তি লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। * * * স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়া-প্রিয়বোধ জাগে, অথবা সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। স্থূল সম্বন্ধ না থাকলে, সুখ-দুঃখবোধ বা প্রচলিত ভাষায় যাহাকে ভোগ বলে—তাহা থাকে না।

মৃত্যু কি?—দেহ স্খলিত হওয়া, লিঙ্গ ও স্থূলের পৃথক্তা হওয়া, ইহাই মৃত্যু। জ্ঞানীর যখন তাহা হয়, তখন সে তাহা দেখিতে থাকে। অজ্ঞানীর মৃত্যু এক প্রকার ক্লোরোফরমের অবস্থা। যে জ্ঞানী ও যোগী, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহত্যাগ করে। দেহত্যাগের সময় তাহার জ্ঞান ত' থাকেই,—বিশেষতঃ উহা তাহার ইচ্ছামূলক।

খদ্যোতের অঙ্গ জ্যোতিঃ যেমন একবার জ্বলে, একবার নিভে, আমাদের দেহাশ্রিত আত্মবোধও সেই প্রকার,—কখনও জাগে. কখনও নিবৃত্ত হয়—সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে না। বলা বাহুল্য, থাকিতেও পারে না। স্থূল বায়ুর ক্রিয়া (শ্বাস-প্রশ্বাস) হইতে এই রূপ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে সাধারণ জীব মাত্রেরই এই আত্মবোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেখানেই জাগরণ সমাপ্ত হয়, মহানিদ্রার সূত্রপাত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা স্বপ্নবৎ মূর্চ্ছিতবৎ মূঢ়বৎ। * * *

সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর সময় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। জ্ঞানের উদয়

নাই বলিয়া, মনুষ্য ত' অজ্ঞান মধ্যেই থাকে—তবে যতদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে, ততদিন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে, বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া থাকে, খণ্ডিত বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান থাকে। ইহা অজ্ঞানমূলক বিক্ষেপ। মৃত্যুকালে বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। প্রাণাপানের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, অজ্ঞানমূলক লয় আসিরা দেহকে অভিভুত করে। এই আবরণই মৃত্যু। তখন জীব-চৈতন্য তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু, যে জ্ঞানী তাহার মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ, সে আত্ম-বিষয়ক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া মৃত্যুকালে অভিভূত হয় না—বোধ হারায় না।

* * কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা বাঁচা স্থূলের খেলা। তাহাতেই বলি—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।

যোগ, যোগী ও যুক্তাবস্থা—লোকে বলে কলিতে যোগ নাই। কেন থাকিবে না? বরঞ্চ বেশী আছে। গৃহী গুরুরা লোককে যোগ দেয় না, তাই লোকে যোগের পথ ঠিক ধরিতে পারে না।

যোগে চিত্ত নির্ম্মল হয়। মনের উপর অনেক ময়লা জমিয়া আছে কি না, তাই কিছু হইতেছে না। যোগে সেই ময়লা দূর করিয়া দিতে পারে। যোগে প্রথমতঃ প্রবৃত্তি আসে না, কিন্তু উহা করিতে করিতে প্রবৃত্তি আপনিই আসে। জীব সাধন বলে যোগ-প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ক্ষমতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, একটা স্বতন্ত্র জগৎই সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে। অর্থাৎ, যোগের স্বরূপ সংঘর্ষ,—মনের সহিত মন্ত্রের সংঘর্ষ।

স্বভাব হইতে বিচ্যুত জীবের স্বভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় হইতেছে কর্ম্ম বা 'ক্রিয়া-যোগ।' ইহা গুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় তদ্দত্ত মন্ত্রের সাধন। * * *

যোগী যখন 'ক্রিয়া'তে যুক্তাবস্থায় থাকেন তখন তাঁহার দেহের কিছু পরিবর্ত্তন হয়; তখন তাঁহার দেহের কোন অনিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু যোগীর সে বোধ থাকে না। একখণ্ড জ্বলন্ত টীকা তাঁহার দেহে সেই অবস্থায় লগ্ন করিয়া দিলে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইবে বটে কিন্তু কোনও জ্বালাবোধ হইবে না। দেহ দগ্ধ হইয়া গেলেও ব্যুত্থানের সঙ্গে নূতন দেহ হইবে। * * সুষুম্না নাড়ীর পথ খুলিয়া গেলে যোগী সর্ব্বদা যুক্ত অবস্থাতেই থাকেন। এমন কি, বাহ্য বিষয়ে চিন্তা করিবার সময়ও যুক্ত অবস্থায় থাকেন, সুষুম্না পথও খোলা থাকে। যোগী যখন 'ক্রিয়ায়' বসেন, সকল আবরণ মুক্ত করিয়া লন। তখন অন্যের দেখা নিষিদ্ধ, উহাতে তাদের অনিষ্ট হইতে পারে। সেই সময়ে দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়—কিছুটা সাদা হয়, এবং আরও কিছু হয়। * * * প্রকৃত যোগীই ঈশ্বর, ঈশ্বরই যোগী। ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব—ইহাই প্রকৃত যোগীর যথার্থ পরিচয়। প্রকৃত যোগী সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত থাকেন বলিয়া সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা যে কোনও স্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারেন।

* * 'যোগ' না হইলে ঠিক উপাদান গঠিত হয় না। উপাদান গঠিত না হইলে প্রবল (ঐশ্বরিক) শক্তির কাছে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগীর উপাদানের সাম্য হ'লে যে দর্শন হয়, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বর-দর্শন। তাহাতে তাঁর লীলা দেখা যায়, অভিভূত হ'য়ে থাকতে হয় না। * * *

চিত্তের সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া, মনকে স্থির ও সবল করাই যোগের লক্ষ্য।

যোগী যোগ দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, যে যত শক্তি বৃদ্ধি করে; সে তত কম অভিভূত হয় এবং মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের লীলা তত বেশী দেখিতে পারে। প্রবল একটা শক্তির কাছে, দুর্ব্বল শক্তি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার। যোগীই তাহা পারেন। সাধকের তাহা সাধ্যাতীত।

লিঙ্গের সহিত শুদ্ধ আত্মা বা সূক্ষ্মতত্ত্বের সংঘর্ষই যোগ। বিষয়টী বড় জটিল। বাস্তবিক পক্ষে স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ প্রতিনিয়তই হইতেছে। ইহা কিন্তু যোগ নহে। আবার কৌশল থাকিলে ইহাও যোগ বটে। স্থূল সূক্ষ্মের রহস্য এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ জানিয়া রাখ—স্থূল জড়, সূক্ষ্ম চেতন এবং লিঙ্গই মন (ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত) এই সূক্ষ্মতত্ত্বকে আত্মা বা পরমাত্মা বলিতে পার। কিংবা ঈশ্বরও বলিতে পার।

এক কোটি লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত যোগী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। যিনি সাক্ষাৎ মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারই আদেশে জগতের উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন—তিনিই যোগী, অন্য সকলে

নামধারী মাত্র। * * * প্রকৃত যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন, তিনিই যোগী। ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ না হইলে মনুষ্য কদাপি যোগী পদ-বাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর।

* * * যোগী ভিন্ন কেহ গুরু-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যোগী গুরু আপন ব্যাপক সত্তার প্রভাবে যুগপৎ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভক্তের আর্ত্তধ্বনি তাঁহাকে আবির্ভূত করায়।

যোগ-বিভূতি—যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ-বিভূতি বলে তাহা যোগ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকাশিতই হয় না। লৌহ দহন-সামর্থ্য লাভ করিলে ঐ শক্তিকে তাহার বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিভূতি পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি স্বরূপ। যখন আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে জীব নিজের পরিচয় কিছু কিছু প্রাপ্ত হয়, ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয় তখন হইতেই তাহার শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বিভূতি আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহার জন্য পৃথক্ প্রয়াস করিতে হইবে কেন? ইহার আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না—চিত্ত শুদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনিই জাগে। রোগ কাটিয়া গেলে যেমন দেহে বল-সঞ্চার হয় এবং ঐ বল যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সেই প্রকার অবিদ্যা কাটিয়া গেলে আত্ম-শক্তির স্ফুরণ হয়, এবং ইহা অবিদ্যা নিবৃত্তির লক্ষণ। * * *

পতঞ্জলি এবং তদনুযায়ী যোগী সম্প্রদায়ের মতে বিভূতি

সকল নির্ম্মল আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে উদিত হয়, এবং উহারা জ্ঞান ও কৈবল্যের প্রতিবন্ধক। কিন্তু আত্মা যদি স্বভাবতঃ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে শক্তির বিকাশ অন্তরায় রূপে পরিগণিত হইতে পারিত। অগ্নির সহিত দাহিকা-শক্তির যে সম্বন্ধ, প্রদীপের সঙ্গে প্রভার যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত আত্ম-শক্তিরও সেইরূপ সম্বন্ধ জানিবে।

যোগাভ্যাস—অনেকের বিশ্বাস 'যোগ' অতি দুরূহ ব্যাপার। বর্ত্তমান সময়ে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ বিকৃত মস্তিষ্ক, কিংবা বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। 'যোগ' যে অত্যন্ত দুরূহ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, দুরূহ হইলেও, সিদ্ধ-যোগীর উপদিষ্ট যোগ মার্গ অতি সরল, তাহাতে কোন প্রকার অপায়ের আশঙ্কা নাই। গ্রন্থ অবলম্বনে অথবা অজ্ঞ লোকের উপদেশে প্রাণায়ামাদি বায়বীয় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে, শারীরিক অপকার অবশ্যম্ভাবী। যিনি যোগের রহস্য এবং মানবের দৈহিক ও মানসিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য অবগত নহেন, তাঁহার যোগ-ক্রিয়ার উপদেশ দানের অধিকার নাই। স্বাভাবিক 'যোগ' অতি সরল ; তাহাতে কোনও প্রকার ভয় অথবা অপকারের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ যোগী অতি বিরল বলিয়াই 'যোগ' এত দুর্লভ ব্যাপার। * * *

যোগ ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না কেন তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। অন্য কোনও প্রকার কর্ম্ম দ্বারা যোগ-লভ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। যোগের স্থান অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না। একমাত্র

যোগ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই চিত্ত ও দেহের স্থায়ী বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না ! * * *

যোগ অভ্যাস না করিলে বিষয় চিন্তা ও তজ্জন্য উদ্বেগ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষকে ছাড়ে না। যোগ করিলে মৃত্যুকালে মনঃ ভগবানে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অন্য চিন্তা আসিতে পারে না। মাছ ধরিবার জন্য চার দিলে ছোট খাট অনেক মাছ আসে, কিন্তু একটা বড় রুই বা কাত্‌লা আসিলে, সেগুলি সব পালাইয়া যায়। ভগবানের চিন্তা রুই-কাত্‌লার মত। আর বৈষয়িক চিন্তা ছোট ছোট মাছের ঝাঁকের মত।

লিঙ্গ-শরীর—আত্মবোধের আবরণ কাটিবার ক্রম আছে বই কি! প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগে, কর্ম্ম ও সংস্কার সকল প্রত্যক্ষ হয়। জীব কবে কোথায় ছিল, কি কর্ম্ম কখন করিয়াছে, তাহার ফলে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন্ সময়ের কোন্ কর্ম্ম হইতে কবে কোন্ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াছে—সব স্মরণ করিতে পারে। কাহার সহিত কখন কি সম্বন্ধ ছিল সব তাহার মনে পড়িতে থাকে। দেখ, জ্ঞান, কর্ম্ম, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ ভোগ যাহা কিছু আমাদের ঘটিতেছে কিছুই লুপ্ত হয় না। লিঙ্গ দেহে সবই সংস্কার রূপে বর্ত্তমান থাকে। স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু লিঙ্গ দেহ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।

—

সৃষ্টির আদিতে লিঙ্গ দেহের বিকাশ হইয়াছে—জন্ম-জন্মান্তর সেই একই লিঙ্গ দেহ কর্ম্মানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ স্থূল-কোষে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি

এই লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। যখন জ্ঞানের আভাস লিঙ্গে জাগে, তখন সেই আলোকে লিঙ্গস্থ সংস্কার রাজি চলচ্চিত্রের ন্যায় সজীব হইয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হয়। অবশ্য প্রথমে স্মৃতিরূপে বোধ জাগে, পরে তাহা প্রত্যভিজ্ঞার আকার ধারণ করে। যেমন একটি সুত্রে সহস্র মণি গ্রথিত থাকে, তেমনই একই লিঙ্গাত্মায় সহস্র সহস্র জন্মের সংস্কার আহিত থাকে। * * *

লিঙ্গ যদিও এক বটে, তথাপি তাহা স্থূলের সঙ্গে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া থাকে, যে তাহা স্থূলের অংশ না লইয়া থাকিতে পারে না। লিঙ্গ স্থূলাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার সাধন করিতে সমর্থ নহে। এমন কি, মৃত্যুর পরেও স্থূলাভাস তাহাতে লাগিয়া থাকে। ইহাকে কর্ম্মাশয় বলে। * * * চিত্তের শোধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূল হইতে লিঙ্গকে বিভক্ত করা যায় না। মনঃ, বুদ্ধি অহংকার সব লিঙ্গেরই বৃত্তি অনুযায়ী নাম মাত্র।

* * * বিশুদ্ধ লিঙ্গদেহ প্রতিষ্ঠার পরে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এই লিঙ্গদেহ গ্রহণই 'জন্ম'। ইহা বস্তুতঃ একবার হয় বলিয়া। তখন জন্মও এক ভিন্ন অধিক মনে হয় না। লিঙ্গদেহ গ্রহণ হইতে লিঙ্গ ত্যাগ পর্য্যন্ত জীবের জীবন—আয়ু। ঐ দেহ গ্রহণই জন্ম, ঐ দেহত্যাগই মৃত্যু। এ জন্মও একবার মাত্র। এ মৃত্যুও তাই।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জন্ম বলি, অর্থাৎ, লিঙ্গের সহিত স্থূলের সম্বন্ধ তাহা লিঙ্গ শুদ্ধ হইলে আর জন্ম বলিয়া মনে হয়

না। লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইলে অভিমান লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাই তখন লিঙ্গই আত্মারূপে প্রতিভাত হয় যেমন এখন স্থূলদেহ আত্মরূপে প্রতিভাত হইতেছে—সেই প্রকার। সেইজন্য সহস্রবার স্থূল সম্বন্ধ হইলেও উহা 'জন্ম' বলিয়া বিবেচিত হয় না। যেমন একটি বস্ত্র গ্রহণ করিলে জন্ম হয় না, ছাড়িলেও মৃত্যু হয় না তদ্রূপ স্থূলের গ্রহণ ও ত্যাগ বস্তুতঃ জন্ম ও মৃত্যু নহে। সকল জীবের একবারই জন্ম হয়, একবারই মৃত্যু হয়।

লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম-চৈতন্য—সংঘর্ষকেই যোগ বলে। স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষকেই আপাততঃ উহা বুঝা দরকার। কিন্তু, বিষয়টি বড় জটিল। বাস্তবিক পক্ষে স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ প্রতি নিয়তই হইতেছে। ইহা কিন্তু যোগ নহে। আবার কৌশল থাকিলে ইহাও যোগ বটে। স্থূল সূক্ষ্ম রহস্য এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ জানিয়া রাখ স্থূল জড়, সূক্ষ্ম চেতন এবং লিঙ্গই মনঃ (ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত)। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বকে আত্মা বা পরমাত্মা কিংবা ঈশ্বরও বলিতে পার। লিঙ্গই জীবভাবের বাহ্য চিহ্ন। আমাদের দেহই স্থূলপদ-ব্যপদেশ্য। বাহ্য স্থূল পদার্থই বিষয়। মনঃ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নিরন্তর হইতেছে। ইহা স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ ব্যতীত অপর কিছু নহে। তবে মনে রাখিতে হইবে, লিঙ্গ তটস্থ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যবর্ত্তী। বদ্ধাবস্থায় স্থূলের সংযোগ বশতঃ লিঙ্গ স্থূল, মুক্তাবস্থায় স্থূল সম্বন্ধ রহিত হয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম! অতএব স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ বাস্তবিক স্থূলের সহিত স্থূলেরই সংঘর্ষ। বাসনাযুক্ত মন

স্থুল বই আর কি? এই সংঘর্ষ কিন্তু যোগ নহে। লিঙ্গের সহিত শুদ্ধ আত্মা বা সূক্ষ্ম-তত্ত্বের সংঘর্ষই যোগ। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে বদ্ধজীবের লিঙ্গ অবশ্যই স্থুল ভাবাপন্ন। পরমাত্মা ও মন্ত্রাদিরূপে ভূত-কঞ্চুক বেষ্টিত বলিয়া স্থুল পদবাচ্য। এই সংঘর্ষই জীবাত্ম-রূপী লিঙ্গ ও পরমাত্মারূপী সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংযোগ, কিংবা মনঃ ও আত্মার সংযোগ। অবশ্য ইহার স্তর আছে। লিঙ্গ ও সূক্ষ্মের পরস্পর ঘর্ষণ হইলেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গাবরণ বাসনা ও সূক্ষ্মাবরণ ভূত-কঞ্চুক নষ্ট হইয়া যায়—বাহ্য-আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার ফলে শুদ্ধ-প্রায় লিঙ্গ ও শুদ্ধ-প্রায় পরমাত্মা জাগিয়া উঠেন। ইহাই এক হিসাবে প্রাকৃতিক চিত্তশুদ্ধি ও দেবতা সাক্ষাৎকার। লিঙ্গ তখন এক প্রকার শুদ্ধ-সত্ত্ব। উহাতে মলের কিঞ্চিৎ লেশ আছে মাত্র; আর পরমাত্মা অপরা দেবতারূপে অভিব্যক্ত।

বাসনা-ত্যাগ—বিকৃত জীবকে প্রকৃতিস্থ করা কি প্রকারে হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে নির্ম্মাণ-গত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুধু ক্রিয়াগত বা নৈমিত্তিক পরিবর্ত্তনে স্থায়ী ফল হইবে না। নির্ম্মাণে যাহা নাই, ক্রিয়াতে তাহার বিকাশ হয় না। কামের উপকরণ সম্মুখে থাকিলে, আমার কাম জাগিয়া উঠে। ক্রোধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই ক্রোধ জাগিয়া উঠে। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমার নির্ম্মাণে অথবা উপাদানে কাম-ক্রোধের বীজ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অবসর পাইলেই তাহার স্ফুরণ হয়। কামাদির নিমিত্ত না থাকিলে যদি আমাতে কামাদি না জাগে তাহা আমার নিষ্কাম

প্রভৃতির নিদর্শন নহে। যখন প্রবল উত্তেজক কারণ সত্ত্বেও কামাদির আবির্ভাব না হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাতে কামাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে।

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ"। এ কথা ধ্রুব সত্য।

বাসনা ত্যাগ ভিন্ন কর্ম্ম সংন্যাস হইতে পারে না।

বিশ্বাস—যাকে বিশ্বাস করবে, আগে তার সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই আবশ্যক।

বিশ্বাস কাহাকে তোমরা বল ? অন্ধ বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, সেরূপ বিশ্বাসে কোনও কাজ হয় না। আগুনকে শালা বল, আর বাবা বল, সে পোড়াবেই। প্রকৃত জ্ঞান হইতে, বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে যে বিশ্বাস জন্মায়, প্রতীতি হয়, সেই আসল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের উপর কার্য্য করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী! * * * অতিশয় মূঢ় লোকেই হঠাৎ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করে; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা তাহা করেন না। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবে, পরীক্ষা করিবে, তবে বিশ্বাস করিবে। সেই বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস, তাই স্থায়ী হইবে এবং তদনুসারে কাজ করিলে সুফল পাইবে।

শাক্ত—শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তি লাভ হয় না। শক্তি ব্যতিরেক স্ব-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না! তোমরা একটু সামান্য তেজেই অভিভূত হইয়া পর—সেই প্রবল তেজের তাপ কি প্রকারে সহ্য করিবে ? প্রথমে তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হও—তখন কোলে উঠিলে আর অভিভূত হইবে না।

লৌহ খণ্ড যেমন অগ্নির আবেশে অগ্নিময় হইয়া যায়। অথচ অগ্নিময় হইয়াও লৌহই থাকে, তদ্রূপ সেই মহাশক্তির আরাধনা দ্বারা নিজেকে শক্তিময়, তেজোময় সম্পন্ন কর। পরে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জাগ্রত থাকিতে পারিবে, অনন্তের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না।

শাস্ত্র বিভিন্ন কেন?—শাস্ত্রের বর্ণনা পূর্ণ সত্যের জ্ঞাপক নহে। যিনি যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ততটুকুই ভাষামুখে উপদেশ রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যিনি যুক্তাবস্থায় পূর্ণ সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই উপদেশ দান ও গ্রন্থ-নির্ম্মাণ কালে আপনাপন চিত্ত গত সংস্কার ও বুদ্ধি-শক্তির প্রকাশ অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য উপলব্ধিতে অভেদ থাকিলেও, বর্ণনা প্রসঙ্গে ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া প্রকট করিতে গেলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অসীম বস্তু সীমার নিগড়ে কখনই আবদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সীমাতে আবদ্ধ হয়, তাহা অসীম নয়। অপরোক্ষ তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না।

শান্তি—* * * সমস্তই আনন্দময়ীর ইচ্ছা! তাঁহার উপর নির্ভর করিলে, সমস্ত বিষয়েই শান্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। * * 'ক্রিয়া' ঠিক ভাবে করিলে, সকল বিষয়ে আনন্দ পাইবেই পাইবে, বিপদ সকল সম্পদে পরিণত হইবে, অশুভ সকল দূর হইবে। * * * যদি চরিত্রবান্ হও, ধর্ম্মপথে থাক,

আর আমার আদেশ মত তোমরা কর্ম্ম কর—জীবনে সুখ ও শান্তি পাবে—পাবে—পাবে।

শিষ্যের সহিত গুরুর সম্বন্ধ—শিষ্যের সহিত গুরুর সম্বন্ধ—পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ শুধু দেহাবস্থাতেই থাকে না—জন্ম-জন্মান্তর ইহা থাকিবে—ইহা শেষ হবার নয়। শিষ্যকে জন্মে জন্মে কৃপা করতে হবে না। চন্দ্র সূর্য্যকে কি রোজ রোজ চালাতে হয়? একবার মাত্র তা'দিগকে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতেই চিরকাল চ'লছে—এ যে তুলার আগুন, নিভবার নয়। * * *

* * গুরুর রক্তের প্রতি ফোঁটাই শিষ্যের কল্যাণের জন্য! গুরুর মুখ্য কার্য্যই পতিত জীবকে উঠাইয়া লওয়া—ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। জ্ঞান দান করাই গুরুর কার্য্য, তাহাতেই তাঁহার সার্থকতা।

শ্বাস-ক্রিয়া—৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য (নাভি-ধৌতি, প্রাণায়াম ও কুম্ভক)।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ—সন্ন্যাস কাহাকে বলে? সম্যক্ প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কি ত্যাগ করিবে? কেন ত্যাগ করিবে? ত্যাগের ফলাফল কিছু আছে কি? এ সব বিচার্য্য প্রশ্ন। দেখ, যাহা তোমার বস্তু নয়, তাহা তুমি ত্যাগ করিতে পার না—কিন্তু কি বস্তু তোমার আপনার, তাহা ভাবিয়া দেখ। যাহা তোমার নিজের হইবে, তাহার উপর তোমার স্বামিত্ব বা অধিকার থাকিবে। এ জগতে কোন বস্তুর উপর,

তোমার তেমন অধিকার নাই। এমন কি, এত যে ঘনিষ্ঠ দেহ, যাহার সহিত তুমি জড়িত হইয়া আছ,—যাহাকে তুমি আপনার বলিয়া জান, যাহাকে তুমি ভ্রান্তি বশতঃ নিজের স্বরূপ বলিয়াই মনে কর, তাহাও তোমার আপনার নহে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে তাহা চালিত হয় না। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়। তোমার ইচ্ছা এখনও এত বিশুদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন হয় নাই যে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া নিজের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। তোমার দেহও বস্তুতঃ তোমার আপন নহে। ইচ্ছামাত্র দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করা তোমার আয়ত্ত নহে। ইচ্ছা করিলে তুমি দেহকে ছোট, বড়, হাল্কা বা অদৃশ্য করিতে পার না। তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পার নাই, দেহকে অধীন করিতে পার নাই, এ দেহ লইয়া স্বামিত্বের অহঙ্কার করা তোমার সাজে না।

মনঃ সম্বন্ধেও সেই কথা। জগতের অন্যান্য সকল বস্তুই এই দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সহিত সম্বদ্ধ। যদি তুমি দেহাদিরই স্বামী না হইতে পারিলে, তবে জগতের কোন্ জিনিষটিকে তুমি আপন বলিতে পারিবে? আসল কথা— বস্তুতঃ তোমার নিজস্ব বলিতে সত্য-সত্যই কিছুই নাই। তুমি আবার কি ত্যাগ করিবে?

সন্ন্যাস বা ত্যাগ ভিন্ন যে মুক্তি হয় না, তাহা ত' ঠিকই। জ্ঞান ভিন্নও মুক্তি হয় না, ইহাও ঠিক। বিদ্বৎ সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তবে যে বলা হয়, সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না—সে শুধু বিবিদিষা সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া। তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস

নহে। বিবিদিষা সন্ন্যাসে কর্ম্ম থাকে। ঐ কর্ম্মই জ্ঞানকে জাগাইয়া বিদ্বৎ-সন্ন্যাস উৎপাদন করে।

সাধনার মূল—জীবে যতক্ষণ গুরুর শক্তি পতিত না হয়, ততক্ষণ সে কোনও প্রকার আধ্যাত্মিক কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। গুরুদত্ত শক্তিই সাধনার মূলধন। * * * বিশুদ্ধ আধারে প্রকাশমান চিৎ-শক্তির সহকারিতা না পাইলে জড়ত্বের আবরণে আচ্ছন্ন জীব কি প্রকারে আবরণ কাটাইয়া নিজের চৈতন্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করিবে? * * * সামীপ্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য ইহাদের মধ্যে একটি ভাবকে সকল সময় নিয়ে থাকা। এইরূপ ভাব-সাধনা সাধকের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। * * * মহাপুরুষের আশ্রয়ই সাধনার মূল। দ্রষ্টব্য—মহাপুরুষের ও যোগীর বাহ্য লক্ষণ।

সাধনার অন্তরায়—'ক্রিয়া' করিতে করিতে যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে উহার দ্বারাই সাধনার সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে। 'ক্রিয়া' যত অধিক করিবে, তত অধিক ফল পাইবে। সব সময়েই স্মরণ করিবে। নানা কাজে চিত্ত লিপ্ত থাকে বলিয়াই উহার বিক্ষিপ্ততা জন্মে। ঠিক কেন্দ্রী করার নামই একাগ্রতা। * * *

রেতঃপাত, বৃথা চিন্তা, বৃথা বাক্য, বৃথা কর্ম্ম, চিত্ত-বিক্ষেপ, এইগুলি সব সাধন-পথের বিশেষ বিঘ্ন। অতিনিদ্রা, অতিভোজন ও আলস্য পরিত্যজ্য।

সিদ্ধি—জ্ঞানলাভ বা শক্তি প্রকাশের তিনটী অবস্থা আছে

বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি তাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি ও অতি-সিদ্ধি, এই তিন প্রকার নামকরণ করিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধি অবস্থায়, শক্তি দ্বৈতভাবে উপলব্ধ হয়,—ইহা জ্ঞেয়, ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে আত্মায় ফুটিয়া উঠে। আত্মার সহিত ইহার অভিন্নতা সম্পাদন, সাধনার পরিপাকে দ্বিতীয় অবস্থায় হইয়া থাকে। তখন অনন্ত শক্তির অন্তর্গত কোন শক্তিরই বাহ্য-স্ফুর্ত্তি থাকে না; শক্তি-পুঞ্জ তখন আত্মাতে অন্তর্লীন ভাবে বিদ্যমান থাকে। আত্মা হইতে পৃথক্ বা দৃশ্যরূপে তাহাদের সত্তা থাকে না। তখন একমাত্র আত্মা আপনাতে আপনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে থাকেন,—ইহাকেই আমি মহাসিদ্ধি বলি। তোমরা হয়ত' ইহাকে কৈবল্য বা অদ্বৈত—স্থিতি বা অন্য কোনও নামে অভিহিত করিবে। কিন্তু ইহার পরেও অবস্থা আছে। এই অদ্বৈত অবস্থা হইতে ইচ্ছানুসারে শক্তির বহিরুন্মেষ, অথবা দ্বৈতের উদয় অতি-সিদ্ধির লক্ষণ। ব্যুৎথান ও নিরোধকে সমান করিয়া উভয়কে সমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অতি-সিদ্ধি অবস্থার উদয় হয়। যোগী কোন অবস্থারই দাস নহেন। দ্বৈত অথবা অদ্বৈত কোন অবস্থাতেই তিনি বদ্ধ হন না—অথচ তিনি সর্ব্ব অবস্থারই দ্রষ্টা ও উপলব্ধি কর্ত্তা।

যে ভাবে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে একটি অবস্থাই ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে হইতে চরম অবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হয়। যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু মহাসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনি

দ্বৈত অবস্থায় বর্ত্তমান। এ অবস্থায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বর্ত্তমান থাকে। উহাকে লৌকিক ও অসিদ্ধ সাধকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। যে অসিদ্ধ, তাহার সাধ্য অথবা উপাস্য বস্তুর বিকাশই হয় নাই। কিন্তু আমি যে সিদ্ধ অবস্থার কথা বলিতেছি, তাহাতে উপাস্য অথবা ধ্যেয় বস্তু সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়—সাধকের দৃষ্টিতে তখন কোনও আবরণ থাকে না। কিন্তু উপাস্য বস্তুর প্রকাশ হইলেও, উপাসকের সহিত তাহা অভেদ প্রাপ্ত হয় না—তখন উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ পরিস্ফুট রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই অবস্থাকেই ইষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহার পরের অবস্থায় এই ভেদ আর থাকে না, তখন উপাস্য এবং উপাসক পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। তখন যে স্বয়ং প্রকাশ সত্তা বিরাজমান থাকেন, তাহাকে উপাস্য কিংবা উপাসক কিছুই বলা চলে না। ইহাই মহাসিদ্ধির অবস্থা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই অদ্বৈত অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং ইহার পরে আর কোনও অবস্থা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইচ্ছার স্ফুরণ মাত্র এই অবস্থা হইতে যদি পূর্ব্ববৎ ভেদাবস্থা জাগান যায় এবং ইচ্ছামাত্রই উহা কেহ নিরুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত অবস্থার প্রাদুর্ভাব করান যায়, তাহা হইলে উহাকে যোগের অতিসিদ্ধ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি ব্যুত্থান এবং নিরোধ, উভয়ের অতীত, যিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের অতীত, এবং যিনি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থার অতীত,

তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে অসঙ্গ স্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। নিজের এই অবস্থার উপলব্ধি করাই অতি সিদ্ধির লক্ষণ।

অতিসিদ্ধ যোগী ক্রিয়াশীল হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্ম-পরায়ণ। কিছুতে তাঁহার বন্ধন নাই। সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত বলাও ভাষার অপপ্রয়োগ মাত্র। ঈশ্বরের সঙ্কল্পে যখন সৃষ্টির উদয় হয়, তখন কি তুমি মনে কর, ঈশ্বর আবদ্ধ হইয়া পড়েন? তুমি কি মনে কর ঈশ্বরের সত্তা হইতে যাহা প্রবাহ ক্রমে বহির্গত হয়, তাহা দ্বারাই ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন? এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। যখন তিনি কোনও শক্তির স্ফুরণ করেন, তখন উহা তাঁহা হইতে যেন কতকটা পৃথক্ ভাবেই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পার্থক্য কখনই হয় না। তদ্রূপ আবার যখন উহাকে প্রত্যার্পণ করিয়া আত্ম-স্বরূপে বিলীন করেন, তখন উহা তাঁহার সঙ্গে অভিন্নবৎ বর্ত্তমান থাকে। ভেদের সময় ভেদও যেমন অলীক, অভেদ অবস্থায় অভেদও তেমনি অলীক, অথচ দুইই সত্য।

বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধি—সিদ্ধি, বাস্তবিক পক্ষে এক ও অখণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভক্তবৎ হইয়া তাহা লোকের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। যাহা সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি ও অতিসিদ্ধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকারান্তরে ক্রিয়াসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনে বিভূতি পাদে যে সকল খণ্ড সিদ্ধির উল্লেখ আছে তাহার অনেকগুলি এই ক্রিয়া সিদ্ধিরই অন্তর্গত। কতকগুলিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিও

বলা যাইতে পারে। নিজের উপাদান বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারিলে, তাহাকে নানা ভাবে কার্য্য করাইতে পারা যায়। বলিতে কি পাতঞ্জলে যে কয়টি সিদ্ধির উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক সিদ্ধি ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। যাহার উপাদান বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইহাতে কিছুই বাহাদুরী নাই।

যে ভাল করিয়া বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়া অবগত আছে, তাহাকে যেমন শব্দের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করিতে বেগ পাইতে হয় না, ঠিক সেই প্রকার যিনি শুদ্ধ সত্ত্বরূপ শক্তির তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি এই স্থূল জগতে না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য নাই। ভূত-জয়, ইন্দ্রিয়-জয় এবং বিবিধ সংযম হইতে যে সকল সিদ্ধি আবির্ভূত হয়, শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত যোগীর পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি, যত্র-কামাবসায়িত্ব, এই অষ্টসিদ্ধি ব্যতিরেকে আকাশ গমন, পরকায়া প্রবেশ, পরচিত্ত জ্ঞান, দূর-দৃষ্টি, দূর-শ্রুতি এবং আরও বহু সিদ্ধির কথা যোগ-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি, পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু সত্ত্ব সিদ্ধি হইলে পৃথক্ ভাবে কোন সিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে হয় না। যোগী যোগ মার্গে অগ্রসর হইলে অবস্থা বিশেষে সিদ্ধি সকল আপনিই উদিত হয়, যে লুব্ধ চিত্তে সিদ্ধির প্রার্থনা করে, সে কখনই প্রকৃত যোগ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

স্থূল-নাশ—১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য—(কৃপা)

সমাধি—সমাধি (জড়-সমাধি নহে, চৈতন্য-সমাধি) প্রকৃত যোগের দ্বার মাত্র। * * জড়-বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, সেটা জড়-সমাধি, তাহ প্রকৃত সমাধি নয়! চৈতন্য-সমাধি লাভ করিতে হইলে একটা চৈতন্যময় কিছু ধরা চাই। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্র ঐরূপ চৈতন্যময় বস্তু। উহার সাধন দ্বারা চৈতন্য সমাধি অর্থাৎ প্রকৃত সমাধি লাভ হয়। সে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। মনেও সম্যক্ ধারণা করা যায় না। ব্যুত্থানে মনে হয়, কি একটা রহস্যময় অবস্থা হইতে আসিলাম। * * *

ভগবানের আরাধনায় সংজ্ঞাহীন হইয়া যাওয়াটা কিছু নয়। উহাতে বুঝিতে হইবে, আসলে কিছু হয় নাই। বরাবর জ্ঞানে থাকিয়া 'কর্ম্ম' করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া পরম আনন্দ পাইবে—ইহাই যোগের অবস্থা। * * *

ভাব-সমাধির বিশেষ মূল্য নাই! ভাব-প্রবণতা কাহারও স্বাভাবিক, কেহ কেহ বা চেষ্টা করিয়া তাহা আনয়ন করেন। অনুশীলনে উহা প্রবল হয়, এবং ক্রমে ক্রমে মনে এরূপ দুর্ব্বলতা আনে যে ভাবের আঘাতেই লোকে সংজ্ঞাহীন হয়। ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনও লক্ষণ নয়। চিত্তের সকল প্রকার চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মনকে স্থির ও সবল করাই যোগের লক্ষ্য।

—বিবিধ—

১। গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর ইহাই কর্ম্ম। হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সাধনা। গুরুদেবের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ, ইহার অমিয় আস্বাদন কেবল অনাসক্ত গৃহী সংন্যাস-ভাবসম্পন্ন পরমহংসই অনুভব করেন।

যাঁহারা ভীষণ কোলাহলপূর্ণ জনতার মধ্যেও গম্ভীর ভাবে চিত্তের অকম্পিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন না, ও নির্ভীক অন্তঃকরণে স্বাভাবিক সরল পথের অন্বেষণে নিভৃতে চিন্তা করেন, তাঁহারাই সংসারে অনাসক্ত পরমহংস। যাঁহারা মৃণাল ছিদ্রভেদী সূত্রের ন্যায় অনন্ত যোগ পথে প্রবেশ করেন, গগন-চিত্রিত নক্ষত্র মণ্ডল ও জগত সকলে গূঢ় প্রবিষ্ট অস্পর্শ গুরুশক্তি যোগে প্রাণীর প্রাণাধার ভেদ করিয়া আত্মযোগে সমস্ত জগৎ সুধাময় বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই সংসারে যোগী।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস দেব।

২। জগৎ প্রসবিনী প্রত্যক্ষ 'মা' যোগে ব্রহ্মাতীত 'মা' মহাভাব তত্ত্বের সারমর্ম্ম 'ক্রিয়ার' দ্বারা হৃদয়ে সর্ব্বদাই গ্রহণ কর। বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্ব্বদাই 'মা'কে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলেই সব হইবে।

৩। দেহ থাকিলে কর্ম্ম করিতেই হইবে। সেইজন্য এমন কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। * * * দুইবেলা যথাসময়ে আহ্নিক করিয়া যাইবে।

চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় হউক, সেইজন্য বিশেষ ভাবিও না। আমার উপর নির্ভর করিতে শিখ, দৈব বা মানুষ, কোন শক্তি তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

৪। দীন-দুঃখীকে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করিও।

৫। তোমরা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিকে ভালবাস—আমাকেও তেমনই আপনার জন ভাবিয়া ভালবাস। আর আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাহি না, তোমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা টাকা পয়সা চায়; কেহ কি বলিতে পার—আমি কখন কাহারও কাছে কিছু চাহিয়াছি?

৬। কোনও বিষয়ে ভাবনা করিও না,—আমি আছি। তোমাদের অনেকের ইচ্ছা হু-হু করিয়া টাকা আসিতে থাক্;—মনে করিও তোমাদের কল্যাণের জন্য যাহা যতখানি দেওয়া বা করা দরকার তাহা আমি দিতেছি ও করিতেছি।

৭। অসৎ সঙ্গ করিও না। মন সর্ব্বদা স্থির ও শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে, এবং মিতাহারী হইবে।

৮। তোমরা যাহা কর, তাহা আমি জানি। আমাকে ফাঁকি দিয়া কিছু করিবার চেষ্টা করিও না।

৯। পরের অর্থে লোভ করিবে না। ঋণ করিবে না, ঋণ রাখিবে না। এরূপ করিলে কখন কষ্ট পাইবে না।

১০। সর্ব্বদা পরের উপকার করিবে। কিছু ত্যাগ স্বীকার ছাড়া পরোপকার হয় না। পরোপকারে ইহলোকে পরলোকে মহাযশ হয়। পরোপকারে যেমন উপকার হয়, পরশ্রীকাতরতায় তেমন অনিষ্ট হয়। ওটা একটা মহাপাপ।

১১। সংসর্গের একটা ফল আছেই। উহাতে এক মনের সহিত অন্য মনের সংঘর্ষ টানিতে থাকে ? ভাল সংঘর্ষে ভাল-উপকার-লাভ হয়।

১২। পরচর্চ্চা, পরদোষানুসন্ধান মহাপাপ। পরের কান-কথা শুনাও পাপ। এরূপ স্থানে যত্নপুর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিয়া কাজ করিবে।

১৩। সাধন-ভজন বিষয়ে লেগে থাকা চাই। লেগে না থাকলে কিছু হয় না। শুধু বচনে কিছু হয় না, কর্ম্ম করা দরকার।

১৪। 'কর্ম্ম' অনবরত দরকার। সকলকেই ইহা করিতে হয়। মানুষ বল, দেবতা বল, কর্ম্ম ব্যতিরেকে কাহারও উন্নতি হয় না।

১৫। কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম নামে তোমরা যাহা কর, তাহাতে অবশ্য কিছু হইবেই হইবে। শিশু মা বলিতে পারে না ওঁয়া-ওঁয়া করিয়া কাঁদে. তাতে কি মা কাছে আসে না ?

১৬। মনের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তিমুখী তাকে নিবৃত্তিমুখী করা বড়ই কষ্টকর বটে। কিন্তু চেষ্টা কর ; চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। চেষ্টা করিলে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব যাহা চাওয়া যায়, তাহাই লোকে পাইতে পারে। শুধু নিজের চেষ্টায় হয় না বটে—গুরুও ত' আছেন।

১৭। উপকার পেলেই, প্রত্যুপকার করতে হয়। না করলে তার ঋণে আট্‌কে থাকতে হয়।

১৮। কারও চোখে-চোখে অধিকক্ষণ, তাকিয়ে থাকতে

নেই, ইহাতে অনেক সময়ে অনিষ্ট হয়। যাহার চোখে তাকান হচ্চে, সে যদি অধিক শক্তিশালী হয়, ত' সব ভাল টুকু টেনে নিতে পারে।

১৯। কাহারও কথায় বিশ্বাস করিও না। যাকে তাকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে অনিষ্ট হয়।

২০। শঠের সঙ্গে শঠতায় তেমন দোষ নাই। তবে, দেখিবে যেন সৎ-লোকের সঙ্গে একটুও শঠতা না করা হয়।

২১। কোনও লোককে বঞ্চনা ক'রো না, কাকেও হেয়-জ্ঞান ক'রো না ; সরলের সঙ্গে অসরল ব্যবহার ক'রো না, অসত্য পথে চলো না ! তা'হলেই সুখে থাকবে। এর বিপরীত করলে কাশীতেই মর বা ভগবানের পায়ের উপরে পড়েই মর, কেউ রক্ষা করতে পারবে না ; আমি কোন্ ছার, আমার বাবাও পারবে না।

২২। অহঙ্কার বড় খারাপ, অহঙ্কার মানুষকে নষ্ট করে। ভগবান্ কারও অহঙ্কার সহ্য করেন না।

২৩। অকৃতজ্ঞতার তুল্য পাপ আর নাই। যদি একদিনের জন্যও কেহ উপকার করে, তা'হলে সেটি মনে রেখে যথাসম্ভব তার প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। তা' না ক'রলে বিশেষ প্রত্যবায় হয়, এমন কি ধ্বংসের কারণ হয়।

২৪। গুরুর আর্থিক ঋণ রাখা কিংবা গুরুর অর্থ আত্মসাৎ করাও মহাপাপ। উহাতেও ধ্বংস অনিবার্য্য।

২৫। শাস্ত্র বেশী পড়িয়া লাভ নাই। তার চেয়ে 'ক্রিয়া' করা ভাল।

২৬। প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে অর্থ আসে। তোমার প্রাক্তনে যে অর্থ আছে তা' আসবেই; তবে, একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকতে নেই। একটু পুরুষকার চাই। পাঁঠা বলি দিতে হ'লে, খড়্গত কাছেই আছে—সেটা ত' আপনা হ'তে উঠে পাঁঠার ঘাড়ে পরবে না, সেটা তুলে পাঁঠার ঘাড়ে ফেলতে হবে।

২৭। যার যার পাপের ফল, সে সে ভোগে; বাপ মায়ের পাপের ফল কেন? ছেলেদেরই পূর্ব্বজন্মের, তারা ভোগে।

২৮। তোমাদের আর জন্ম হবে না। আমার শিষ্যদের আর জন্মিতে হবে না। শিষ্যদের জন্য জ্যেঠা-গুরুদেব (পূজ্যপাদ ভৃগুরাম পরমহংস দেব) একটি ধাম প্রস্তুত করিয়াছেন; শিষ্যেরা সেই ধামে থাকিবে।

২৯। যখন আহ্নিকের সময় হ'লে অন্য কাজ ছেড়ে তা'ই করবার জন্য ব্যগ্রতা আসবে তখন বুঝবে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

৩০। কর্ম্ম না করিলে ফললাভ হয় না। যে কর্ম্ম যত তীব্রভাবে করিবে, তত শীঘ্র ফল পাইবে। সর্ব্বপ্রথম চাই চরিত্র। চরিত্র ভাল রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। তারপরে চাই অল্পাহার ও অল্পনিদ্রা। 'ক্রিয়া' করিতে করিতে এগুলি হইয়া যায়। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যায়।

৩১। সৎ-প্রসঙ্গ লইয়া থাকিলে লোকের সঙ্গবৃত্তি বাড়ে। যেখানে সৎ-প্রসঙ্গ হয়, সেখানে দেবতাদেরও আগমন হয়।

৩২। মানুষের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দিয়া তাড়িত শক্তি বেশী চালিত হয়। সেইজন্য মাত্র ঐ আঙ্গুলটি দিয়া কোন কাজ—

দাঁত মাজা, কিছু দেখান ইত্যাদি করিতে নাই। তাহাতে তাড়িতের অপচয় হয়।

৩৩। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া 'ক্রিয়াদি' করিয়া, ব্রহ্মের অণুতে থাকা, এই ত' পরমপদ।

৩৪। তুমি যেমন গুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিয়াছ, করিতেছ, সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তবে তোমার শিষ্যেরা জ্ঞানের অধিকারী কেন না হইবে? কেন জন্মিবে?**

৩৫। সকলেই "ক্রিয়া" করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা-বাঁচা স্থূলের খেলা। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।

৩৬। যাহা করিবে, তাহা বলিবে না, গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলে 'ক্রিয়া' নষ্ট হয়।

৩৭। ঠিক ঠিক ভাবে 'ক্রিয়া' করিলে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবে। দুঃখ ব্যতীত এ জগতে সুখের আশা কই।

৩৮। মন সকল দিকে যাউক না কেন, 'কার্য্যের' সময় ক্ষণকালের জন্য ঠিক থাকিলে যোগের উপদেশ আমাদের যেমন সহজসাধ্য তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। তবে, আসন ঠিক ভাবে হওয়া কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত যোগ প্রাপ্তি কোন যুগে, কোন কালে, হইবে না।

৩৯। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনিই শোক হইতে পরিত্রাণ পান।

৪০। জ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব, চেতন-শক্তি। যোগীরা

ইহাকে স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্মৃতি, বুদ্ধি, বাক্য, মন, দর্শন, শ্রবণ— এ সকল ঐ শক্তিরই বিকাশ।

৪১। যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করেন, তিনি নিশ্চয় মূলধনে বঞ্চিত হইবেন চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৪২। লালসা না ত্যাগ হইলে বিশুদ্ধ আনন্দের আশা কোথায় ?

৪৩। ভোজনে, ভ্রমণে, শয়নে, স্বপনে অবিনাশী, নিত্য পুরুষোত্তমে ধ্যান বা চিন্তা যাবৎ জ্ঞানময় আত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে মনোলয় না হয়, তাবৎকাল সাধক কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ ও হোমাদির দ্বারা যোগাভ্যাস করিবেক। কর্ম্মফল আছে কি না আছে— এরূপ সন্দিগ্ধ মতি যে ব্যক্তির আপ্লুত চিত্ত হয়, তাহাকে জ্ঞান-অসিদ্ধ, অর্থাৎ অনধিকারী বলিতে হইবে। মন স্থির না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। এজন্য বেদাদি শাস্ত্র সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস দেব
(জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম, পাঞ্জাব)

৪৪। 'কর্ম্ম' করিতে কাহাকেও ক্ষান্ত দিও না। যদ্রূপ তৈল বিনা তৈলের দীপত্ব থাকে না, তদ্রূপ বিনা 'কর্ম্মে' শরীরের ও শরীরস্থ শক্তিতে পায় না। অতএব, যখন 'কর্ম্মের' অবিশ্রান্ত গতিরোধ না হইবে, ততদিন 'কর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? সেইজন্য গুরুদেব

প্রথমতঃ শমদমাদি গুণের দ্বারা শিষ্যকে প্রবোধিত করিয়া পশ্চাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে বোধ করাইতেন।

৪৫। কর্ম্ম না করিলে কিছু হবে না, বাবা; কর্ম্ম করা চাই, বচনে কিছু হয় না। কর্ম্ম, অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট যোগাভ্যাস। কর্ম্মভ্যো নমঃ।

৪৬। বাপু, দৃঢ়তার সহিত প্রত্যহ নিয়ম মত যথাসময়ে ক্রিয়া করিয়া যাইবে, সকল কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে, বৃথা কর্ম্মে বা বাক্যে সময় কাটাইও না। দেখিবে কোন বিষয়ে অভাব থাকিবে না,—তিনি কোন অভাব রাখিবেন না। যদি অর্থ চাই, তাহারও অভাব হইবে না—এমন কি না চাহিলেও পাইবে।

৪৭। তোমার মধ্যেই সব আছে। সংস্কার দ্বারা আবরণ ঘটিয়াছে, ময়লা পড়িয়াছে। সেই আবরণ মুক্ত করিতে হইবে, ময়লা পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহা হইলেই আবার তোমাকে তুমি বুঝিবে। আয়না যেমন ময়লা ধরিলে তাহাতে মুখ দেখা যায় না—ময়লা তুলিয়া ফেলিলে, ঘষিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিলে আবার স্বচ্ছ হয়, মুখ দেখা যায়, ইহাও সেইরূপ।

৪৮। ঘষা-মাজা অর্থ—'ক্রিয়া' বা যোগাভ্যাস। যত খাটিবে ততই পরিষ্কার হইবে। ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে হইবে। জপের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইবে। ভোর রাত্রে উঠিবে। সাড়ে তিনটায় চারটায় উঠিয়া 'ক্রিয়ায়' বসিবে, এবং দুই তিন ঘণ্টা 'ক্রিয়া' করিবার চেষ্টা করিবে এবং ঠিক সন্ধ্যায় বসিয়া দেড় দুই ঘণ্টা 'ক্রিয়া' করিবে। তা'ছাড়া সর্ব্বদাই মনে মনে জপ করিবে।

বৃথা সময় নষ্ট না হয়। বাহিরে কাজ কর না কেন, মনে মনে জপ চলুক। শ্বাসে শ্বাসে জপ চলিবে—যাহাকে অজপা-জপ বলে।

৪৯। বাপু, 'কর্ম্ম' ছাড়া কিছু হইবে না। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল নিশ্চয়ই পাইবে। কেহ আটকাইতে পারিবে না। * * কেবল শাস্ত্র পড়িলে কিছু হইবে না। রসগোল্লার গল্প শুনিলে রসগোল্লার আস্বাদন পাওয়া যায় না—খাইতে হইবে। তবে রসগোল্লা যে কি তাহা বুঝিবে, উপলব্ধি হইবে। গল্প শুনিয়া কিছু হইবে না।

৫০। যোগাভ্যাস ছাড়া প্রত্যক্ষ হইবে না—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। 'ক্রিয়া' উপযুক্ত আসন করিয়া জপ। ইহাই কর্ম্ম। এ ছাড়া আর সব যাহা কর, তাহা সবই অপকর্ম্ম জানিবে। কর্ম্ম বলিতে ঐ একমাত্র 'কর্ম্ম'। ঐ কর্ম্ম হইতে সব হইবে। 'কর্ম্ম' হইতে জ্ঞান আসিবে। জ্ঞান হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেম। 'কর্ম্ম' করা চাই; কর্ম্মই প্রধান। সুতরাং কর্ম্মভ্যো নমঃ।

৫১। রেতঃপাত যত কম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা এবং কপটতা ত্যাগ।

৫২। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সরল সত্য অবলম্বন করিবে। এ ছাড়া আহার বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা এবং রাত্রে সামান্য আহার করাই ভাল। পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করা উচিত। * * সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

৫৩। যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করিবে। না দিলে

পাইবে না। যেমন দিয়া যাইবে তেমন পাইবে। দান একটা সৎ-বৃত্তি; সৎ-বৃত্তির অনুসরণ করিতে হয়। অত বিচার করিলে চলে না। প্রার্থী যদি শঠ হয়, মিথ্যা কথা বলে, সে পাপ তাহার—তাহাতে তোমার প্রত্যবায় নাই। * * যদি কেহ তোমার দান লইয়া মদ্যপানাদি পাপাচারও করে তোমার কোন প্রত্যবায় হইবে না, কারণ তোমার নিকট ত' সে মদ্যপানের জন্য অর্থ-ভিক্ষা করিতেছে না। তুমি সরল ভাবে যথাসাধ্য দিবে; যে পাপ কর্ম্ম করে সে তাহার ফলভোগ করিবে। তুমি তাহার পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী নও!

৫৪। আকাঙ্ক্ষা বাড়াইও না। সেটা কষ্টের, দুঃখের কারণ। পুকুরের পরিসর যত বাড়াইবে, জল ততই বাড়িতে থাকিবে। পরের পিছু মুখ ঢুকলান ভাল নয়। যে যাহাই করুক না তুমি তোমার অবস্থা বুঝিয়া চলিবে, তাহাতে কোন লজ্জা বা কষ্ট নাই। অভাব ত' আমরা সৃষ্টি করি। অভাব বাড়াইয়া সেই অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া নানা দুঃখভোগ করিবার কি দরকার?

৫৫। ঋণ অতি খারাপ জিনিষ। ঋণ মহাপাপ। ঋণ করিও না, ঋণ রাখিও না। একবেলা খাইয়া থাকা ভাল, একদিন অন্তর খাওয়া ভাল, তথাপি ঋণ করিয়া খাওয়া ভাল নয়। ঋণে সব নষ্ট হয়।

৫৬। দরজার মোড়ে বসিও না। ভূমিতে বা কোন স্থানে বিনা কারণে আঁক কাটিও না। বিনা কারণে কোন প্রকার শব্দ

করিও না। এগুলি বড় খারাপ—উহাতে বড় অনিষ্ট হয়! দরজার সম্মুখে বসিলে ঋণ হয়—ঐরূপ কাজ করিও না।

৫৭। কাহারও গা' ঘেঁসিয়া বসিও না, বিশেষতঃ ভিন্ন শ্রেণী, ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের সহিত। উহাতে উভয়ের পরমাণু সংস্রবে উভয়েরই অনিষ্ট হয়। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য শুদ্ধতা বজায় রাখা বি:শেষ দরকার। তাহা না করিলে সাধন সম্বন্ধে উন্নতির বিঘ্ন হয়।

৫৮। 'ক্রিয়া সম্বন্ধে, কোন দেব-দেবী সম্বন্ধে, কোন প্রকার ভাল স্বপ্ন দেখিলে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা ভাল নয়। তৎসম্ব ন্ধ কাহারও নিকট আলোচনা করিও না। কারণ, তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, যে জিনিষ তোমাতে আসিতেছে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। একটা সৎভাব আসিবার পূর্ব্বে, তোমার মধ্যে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বাভাস ঐরূপ পাওয়া যায়। সে সময় তাহা বিশেষ গোপনে রাখিয়া, নিজের মধ্যে রাখিয়া, সে বিষয়ে আরও যত্নবান্ হইতে হয়। তাহা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিলে—বাহিরে প্রকাশ করিলে, তাহা আর দেখা দেয় না। আবার সে জিনিষ আসিতে অনেক দেরী হয়—এ জীবনে আর নাও আসিতে পারে।

৫৯। সংসারে যাহাকে আমরা পরম আত্মীয় মনে করি, এবং সেই জ্ঞানে বা মোহে যাহাদের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আত্মীয় নহে, পরস্পর স্বার্থে জড়িত। সেই স্বার্থের একটু ব্যাঘাত হইলে দেখিবে, তাহা:ের ব্যাঘাত কি হয় দেখ না, বিষয়ের জন্য, স্বার্থের জন্য, এমন কি একটু কড়া কথার

জন্য পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, স্ত্রী-স্বামীতে কত বিবাদ, কামনা মোকদ্দমা হইতেছে। যতক্ষণ তাহাদের স্বার্থ সাধন করিতে পারিবে, তাহারা যাহা চায়—তাহাই যোগাইতে পারিবে, ততক্ষণই তাহারা তোমার মিত্র, একটু ত্রুটি হইলেই অমনি গোলমাল। কিন্তু, এক আত্মীয় আছেন তাঁহাকে স্মরণ কর, তাঁহার সহিত ভালবাসা কর,—দেখিবে কত ভালবাসা তিনি দিবেন। কৃপার অন্ত নাই, দয়ার অন্ত নাই, দানের অন্ত নাই। যদি প্রেম-ভালবাসা করিতে হয়, তাঁহার সহিত কর। সে প্রেমে, সে ভালবাসায়, বিচ্ছেদ নাই, পরিতাপ নাই—কেবল সুখ, কেবল শান্তি, কেবল আনন্দ!

৬০। প্রয়োজন হইলে সত্য কথা বলিবে, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হয়, হইবে ; পিরীত চটে চটিবে—সত্য কথা বলিতে ভীত হইবে না। সত্য বলিবে, স্পষ্ট বলিবে। অবশ্য, বিনা প্রয়োজনে কাহারও মনে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। প্রয়োজন বিনা অপ্রিয় বলিবে না কিন্তু আবশ্যক হইলে, প্রয়োজন হইলে, সত্যই বলিবে।

৬১। কোন বিষয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হইও না। একটা কিছু দেখিলে, কি শুনিলে, অমনি তাহাতে মেতে উঠিলে—এটা একেবারেই ভাল নয়। সকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে, বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবে, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিবে, তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিবে। নচেৎ পরিতাপ করিতে হয়।

৬২। অজ্ঞানে যে পাপ করা যায় তাহা জ্ঞানলাভে খণ্ডন

হয়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডন হয়, কিন্তু তীর্থের পাপ খণ্ডন হয় না। কঠোর তপস্যা দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু সে ত' অতি দুঃসাধ্য!

৬৩। ভগবানের সৃষ্ট সকল জিনিষেরই প্রয়োজন আছে, উপকারিতা আছে, কোন জিনিষই খারাপ নয়। ব্যবহার হিসাবে সুফল বা কুফল প্রদান করে। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিলে সকল জিনিষ হইতেই উপকার পাওয়া যায়। সাপের বিষও ত' কাজে লাগে, গো।

৬৪। তোমাদের মনে ভগবৎ-শক্তি বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা শিক্ষার জন্যই মধ্যে মধ্যে আমাকে যৌগিক-শক্তির খেলা দেখাইতে হয়, এবং সেইজন্য আমাকে দণ্ডও গ্রহণ করিতে হয়;

৬৫। সব কাজের বেলা সময় পাওয়া যায়, কিন্তু 'ক্রিয়ার' প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে উন্নতি হইবে কি প্রকারে? একটি টাকা রোজগার করিতে হইলে কত খাটিতে হয়, একটু পড়া মুখস্থ করিতে হইলে কত পরিশ্রম করিতে হয়—আর জগতের মধ্যে সব চেয়ে এই বড় কাজটা, বিনা আয়াসে আয়ত্ত হইতে হইতে মনকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না। ভাল করিয়া তাহাকে পোষ মানাইতে হইবে। রোজ কাহাকেও যদি তাড়াইয়া দেওয়া যায়, সে কি আর তোমার কাছে কখনও ফিরিয়া আসে? সে রকম চিন্তাগুলিও স্থিরভাবে তাহাকে তাড়াইতে হইবে।

৬৬। বাহিরের (সদ্‌গুরু) শক্তি তোমার মনকে ভাল

করে দিতে পারে বটে, কিন্তু তাতে তোমার উপকার স্থায়ী হবে না। নিজের চেষ্টায় নিজকে গড়ে তুলতে হবে।

৬৭। আমি শুধু দেখি, তোমাদের কতটা দৌড়, তাই আমি ছেড়ে রেখেছি। তবে যখন অতিরিক্ত হ'তে থাকে, তখনই তীব্র আঘাতের দ্বারা চৈতন্য সঞ্চার করে দেবো! এই কথা বেশ উপলব্ধি করবে এক সময়ে।

৬৮। বৃথা চিন্তা করিও না—আমি আছি। যদি কোন গুহ্য প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে 'ক্রিয়ার' অব্যবহিত পরেই আমার নিকট উহা নিবেদন করিবে। মৌখিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

৬৯। ভগবান্ যে উপাদানে প্রস্তুত, উহাকেও বিজ্ঞান দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ প্রস্তুত হইয়াছেন—সেই মহাশক্তি হইতে। এই মহাশক্তিকে কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ নারায়ণী বলিয়া থাকে। তাঁহারই খেলা চলিতেছে। 'পুরুষের' নিজের কোন শক্তি নাই, 'প্রকৃতির' সাহায্য ব্যতিরেকে।

৭০। সাংসারিক উন্নতি ও 'ক্রিয়া' একসঙ্গেই চলিতে পারে। একদিক ভাল হইলে, সব দিক ভাল হইয়া যায়। ধর্ম্মকে ঠিক ভাবে গঠন করিতে পারিলে অন্যান্য পার্থিব জিনিষ গুলি আপনিই হইয়া যাইবে।

৭১। যদি তুমি যোগ-ক্রিয়া শিখ, তাহা হ'লে তোমাকে অর্থের জন্য ভাবতে হবে না। অর্থ তোমার কাছে আপনিই আসবে! চেষ্টা কর; অত জিনিষ চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হয়েছ, এতেও যদি চেষ্টা কর, কৃতকার্য্য কেন না হবে।

৭২। বাপু, সবই নিজের কর্ম্মের ফল! সেই কর্ম্ম আর বাড়াইও না। কেবল দুঃখ টুকুই দেখ, কিন্তু কত রাশি রাশি দুষ্কৃতির ভোগ ঐ দুঃখ টুকুতেই কাটিয়া যাইতেছে—তাহা ত' দেখ না! দুষ্কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, আর নূতন কষ্টের সৃষ্টি হইবে না।

৭৩। জীবের নীচ ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতে ফুটিয়া উঠে। স্থূল-বায়ু মণ্ডল পর্য্যন্ত অর্থাৎ, যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের 'ক্রিয়া' বর্ত্তমান আছে, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘিরিয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে, মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ দশা প্রাপ্ত হইবার আশা নাই।

৭৪। সংসারে সবই আশ্চর্য্য! শান্তি কেউ চায় না। আমার উদ্দেশ্য মহাঘাতকদিগকে উদ্ধার করিব; তাতেই পাপীদিগকে স্বর্গ সুখ দিবার জন্য তোমায় শিষ্য করিতে বলা। করি এক, সবে করে এক।

৭৫। 'শক্তির' আরাধনা ভিন্ন শক্তি লাভ হয় না। সেই মহাশক্তির আরাধনা কর, নিজকে শক্তিময় কর, তেজোময় কর। শক্তি না থাকিলে কোনও কর্ম্ম হয় না।

৭৬। সমস্ত অশান্তির মূলে যে একটি অভাব রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দীনের ঐশ্বর্য্য-লালসা, বদ্ধের

মুক্তি কামনা, রূপানুরাগীর রূপ-তৃষ্ণা, কামুকের কাম-পিপাসা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলিপ্সা যাহার যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, সেই এক আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর।

৭৭। তোমার অভাব তুমি নিজে কখনও মেটাতে পার কি? তুমি নিজকে অজানা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পার কি? তোমার সুখ ও আনন্দের বিধান তুমি করতে পার কি? তাঁর উপর নির্ভর না করলে জীবনে এক পদও এগুতে পারবে না। সেইজন্য, সব সময়েই তাঁকে মনন দ্বারা ছুঁয়ে বা শরণাগত হয়ে থাক। তাঁর উপর সব ছেড়ে দাও, দিয়ে কাজ করে যাও। এদিক ওদিক দেখো না, দেখবে সব ঠিক হ'য়ে গেছে। শিশুরা যেমন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে না, আর বাপ-মায়ের উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—এই ভাবটা মনের মধ্যে প্রবল করে তোলে, দেখবে পরম শান্তি পাবে। আর তোমাকে তিনি ঠিক পথেই চালাচ্ছেন। এই পথে যদি তোমার কোন দুঃখ বা অর্থ-নাশ হয়,—সেটা তিনি ঠিকই করিয়েছেন—তোমারই মঙ্গলের জন্য! তিনি তোমাকে রক্ষা করে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। ভয় নেই। তবে, নির্ভর করতে পারা চাই—কোন বষয়ে বৃথা চিন্তা না করা। * * * 'ক্রিয়া' করিতে করিতে নির্ভরশীলতার ভাব জন্মিবে।

৭৮। কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা দৃঢ়তার সহিত সাধনা করিবে। যে কর্ম্মই কর না কেন, তাহাতে যদি সিদ্ধি-লাভ কবিতে চাও, তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইবে—তখন এদিক ওদিক

দেখিবে না, তাহাতে অবহেলা করিবে না, একনিষ্ঠ হইয়া সে কাজ করিয়া যাইবে— দেখিবে সুফল পাইবেই। তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না, ব্রহ্মা বিষ্ণুও না।

৭৯। মনুষ্যের অসাধ্য কি আছে? তোমার মধ্যে কি শক্তি আছে তাহা তুমি জান না; দৃঢ়তা চাই, একনিষ্ঠ হওয়া চাই, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা চাই। সৎ-কর্ম্মে বাধা বিঘ্ন ত' আছেই।

৮০। শ্রীভগবানের কৃপা না হইলে কি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়?—আরে বেটা, কৃপা ত' আছেই। তাঁর কৃপার কি অভাব আছে? কৃপা সর্ব্বদাই পূর্ণ মাত্রায় বর্ষণ হইতেছে। সূর্য্য কিরণ দিতেছেন, কিন্তু তুমি যদি ঘরের ভিতর বদ্ধ হয়ে বসে থাক, সূর্য্য কিরণ তুমি ভোগ করতে পার না। সেইরূপ কৃপা উপলব্ধি করবার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। আধার প্রস্তুত করিতে হয়। কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে হয় না। 'ক্রিয়া' না করিলে, সাধনা না করিলে, যোগাভ্যাস না করিলে, তাঁর কৃপা যে তোমার উপর সর্ব্বদা বর্ষণ হইতেছে - তাহা বুঝিতে পারিবে না।

৮১। কিছুতে ম'জ না বাপু, ম'জলেই মুস্কিল। সংসারী লোক, সবই ক'রতে হয়। না ক'রলে তারা ছাড়বে কেন? ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়, পরিবার—এ সব ত' আছে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। অর্থের আবশ্যক, সর্ব্বদাই আবশ্যক। মসলা ত' চাই, তা' না হ'লে ত' কিছু চলবে না। কাজেই অর্থ

রোজগারও ক'রতে হবে ; তবে তাহার জন্য নীচ-বৃত্তি অবলম্বন করিও না, মর্য্যাদা নষ্ট করিও না, অসৎ পথে যাইও না—সৎপথে সব কাজই ক'রবে—ক'রতে হবে। তবে, তা'তে ম'জো না। পাত্রে পারদবৎ, পদ্ম পত্রে জলের ন্যায়।

৮২। 'ক্রিয়া' করিয়া সাধনা দ্বারা কি করিয়া বুঝিতে পারিবে ? এই ধর, কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছ। কলিকাতা হইতে যত দূরে যাইবে—কাশীর তত নিকট হইতেছ, কেমন ? সেইরূপ সংসারে, বিষয়ে যত আসক্তি কমিতে দেখিবে, বুঝিবে সেই পরিমাণে তত অগ্রসর হইতেছ। এদিকে ক্রমে ক্রমে বিরক্তি আসবে, এ সব আর তত ভাল লাগবে না। ক'রতে হয় ক'রছি, নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচি, এইরূপ ভাব মনে আসিবে। তখনই জানিবে ওদিকে একটু ভালবাসা হ'য়েছে।

৮৩। উপযুক্ত সময়ে সকল কাজ করিবে। সময় অতিবাহিত করিয়া, অসময়ে কাজ করিলে, সে কাজের সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না। 'ক্রিয়া' ঠিক সময়ে করিলে তাহার যেরূপ ফল পাওয়া যায়—অসময়ে করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ অসুবিধা না হইলে ঠিক সময়ে 'ক্রিয়া' করিবে। রাত্রি চারটায় উঠিয়া 'ক্রিয়ায়' বসিবে, এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত করিবে ; এবং সন্ধ্যায় ঠিক সূর্য্যাস্ত সময় 'ক্রিয়ায়' বসিবে। ঐ সময় 'ক্রিয়া' করিলে তাহাতে সুফল পাইবে। অন্যথায় সেরূপ ফল হইবে না। তবে, সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া যেন 'ক্রিয়া' বন্ধ করিও না। একেবারে বন্ধ করা অপেক্ষায় অসময়ে করা ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু

ফল ত' হবেই, তবে সময়ে করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। বাপু, মনে রাখিও "ক্ষুধার সময় খেতে না দিলে, ভাল লাগে না সুধা পেলে।"

৮৪। কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। সৎ-কর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে এমন অভ্যাস হইবে যে আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম নিজে চেষ্টা ক'রে 'ক্রিয়ায়' বসিতে হইবে, তারপর এমন হইবে যে না বসিলে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিবে। গুরু উপদেশ দেবেন, বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন,—কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যে কাজ ক'রবে সেই তার ফল পাবে। দৃঢ়তার সহিত নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ ক'রতে হবে, খাটতে হবে। গাল-গল্প করলে কিছু হবে না। 'ক্রিয়ার' অভ্যাস ক'রলে আর তাহা ছাড়তে পারবে না।

এই দেখ না বাপু, আমি আজ দুই তিন বৎসর নানা কারণে নানা প্রকারে ভুগিতেছি, কিন্তু কোন দিন দেখেছ' কি নিজের কাজ বন্ধ গেছে? * * * এই ত' সব কাছেই শুয়ে থাকে, একদিন কি শরীর অসুস্থ ব'লে আসল কাজে অবহেলা করেছি? ঠিক রাত্রি বারটা বাজলেই তখনই উঠে পড়েছি— আসনে ব'সেছি। আর শুয়ে থাকতে পারি নাই। নিজেকেই সব ক'রতে হবে—আলস্য ত্যাগ ক'রতে হবে।

৮৫। সংসার বাহিরে নহে—মনে। তাই সংসারের সব সুখ দুঃখ মনেরই খেলা। মন নিরাসক্ত ও নির্বিষয় হইলে সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। চিত্তই সংসার;

অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত চিত্ত-শুদ্ধি করিতে হইবে। মানুষের মন যেরূপ— মানুষও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

৮৬। চিত্ত বা মনোনাশের একটি প্রধান উপায়—অতীত ও সুদুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিও না। ধন-সম্পদাদি যে কোন বস্তুর কথা বল না কেন—বস্তু যে সময়ে পাওয়া যায়, মাত্র সেই সময়েই লোকের আনন্দদায়ক হয়। ইহার পূর্ব্বে বা পরে, উহা তুষ্টিজনক হয় না। অতএব বৈষয়িক সুখ মাত্রই ক্ষণিক।

৮৭। ইষ্ট-দেবতার যে পরমাণু মন্ত্র জপের বলে সাধকের দেহেও সেই পরমাণুর সৃষ্টি হয়। দেবতার পরমাণু সাধকের শরীরে, সাধন দ্বারা উৎপন্ন হয়। পরমাণুর সাম্য না হইলে দর্শনাদি হয় না।

৮৮। জপ, জপের মত হওয়া চাই—তবেই না তেমন ফল। গুরুদত্ত বিধিমতে যথাযথ ভাবে সাধ্যমত মনটা নিয়েই ত' কাজ।

৮৯। ঠিক মত মুক্তি যাহা, তাহা মায়াতীত অবস্থা। তখন যোগী আদি-শক্তির স্পর্শে, আদি-শক্তির মতই হয়।

৯০। গ্রন্থ হইতে জ্ঞান জন্মে না। চিত্তের সংস্কার ব্যতিরেকে জ্ঞানের উদয় হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সদ্‌গুরু নির্দিষ্ট ক্রম ও প্রণালী অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্তের সংস্কার হইতে পারে না। অসংস্কৃত চিত্তে কি তত্ত্ব-জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে? গুরু-জ্ঞানের কোনই মূল্য নাই। কর্ম্ম না করিলে কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হইবার নহে।

৯১। * * * কুঁড়িতে যেমন ফুল আছে, ফুলেও তেমনই

কুঁড়ি আছে। বীজে যেমন বৃক্ষ আছে, তেমনই বৃক্ষেও বীজ আছে। প্রকাশকাল বা অভিব্যক্তির কারণ সামগ্রী পাইলেই, কুঁড়ি পুষ্পরূপে ও বীজ বৃক্ষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

৯২। মানুষ যে কত মহৎ, কত বড়, তাহা আত্মবিস্মৃত হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন সৎপথে চলিতে পারিলে আবার সব বুঝিতে পারিবে—এইজন্যই কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার দেখান হইয়া থাকে। এই সব দেখিয়া যখন মনুষ্য বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে, শুধু কর্ষণের অভাবে তাহার বিকাশ হইতেছে না, তখন সে বহির্মুখতা ও বিষয় লিপ্সা ত্যাগ করিয়া যথার্থ বৈরাগ্য ও বিবেককে সঙ্গে করিয়া অনাসক্ত কর্ম্মীরূপে পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে।

৯৩। প্রথম 'আমি তোমার'; তারপর, 'তুমি আমার', তারপর তুমিই আমি হইয়া যায়। কিন্তু বাপু, ঐ ভাব রাখা দুষ্কর। অহংকারই সব মাটি করে। শাস্ত্র মেনে, গুরুবাক্য ধ'রে ক'জন চলে? তা'হলে জীবের এত দুর্গতি কেন? কাল-মাহাত্ম্য ত' আছে, কলিতে অধিকাংশই মুখ-সর্ব্বস্ব-কর্ম্মী পাওয়া কঠিন।

৯৪। দেখ, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা বড়ই খারাপ। সৎপথে যারা যেতে চেষ্টা করে, তাদের ঐ সকলের দিকে খুব লক্ষ্য রাখা চাই, তবে ঠিক রাস্তায় যেতে পারে। দেখ, মনে কত ভাব ওঠে। জন্ম-জন্মান্তরের স্তূপীকৃত রাশি রাশি সংস্কার একত্র হইয়া আছে। সেই সকল লইয়া মন সর্ব্বদাই খেলা

করিতে চায়, চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে চায়। ঈশ্বর-মুখে যাইতে হইলে, এই প্রবল শত্রুকে স্বীয় বশে আনিতে হইবে, নতুবা উহা সম্মুখের দিকে তোমাকে টানিয়া লইয়া আসবে, নিক্ষেপ করিবে। মন-মাতুয়া সকলেব অনিষ্টের মূল।

৯৫। ভাল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইতে হইলে, সেই বিষয় তীব্রভাবে আলোচনা বা চিন্তা করা দরকার। খারাপ পরমাণু-গুলি এখন তোমার মধ্যে তুব প্রবল আছে বলিয়া, ভাল বিষয়ের পরমাণু আসিতে পারিতেছে না। তীব্র সংঘর্ষের দ্বারা খারাপ পরমাণুগুলি পরাজিত হইবে। পুর্ব্বেকার সংস্কারগুলি এখনও প্রচ্ছন্নভাবে তোমার মধ্যে রহিয়াছে। * * * মনটাকে কখনও বিচলিত হইতে দিবে না।

৯৬। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা হইতে যথাসময়ে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম আপনিই উদিত হইবে। * * শুধু ভাব প্রবণতা অথবা শুষ্ক গ্রন্থাধ্যয়ন-মুলক তর্ক বিচার হইতে প্রকৃত ফল লাভের আশা নাই—কর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন।

৯৭। আলস্য ত্যাগ করিয়া গুরু নির্দ্দিষ্ট সাধন-ক্রমের অভাাস করিবে। অভ্যাসের মাহাত্ম্য অনন্ত! তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

৯৮। কখনও নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিবে না ও অন্যের নিন্দা করিবে না। অন্যের কার্য্যের ভাল-মন্দের আলোচনা ঠিক না। কে, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে বিচারের অধিকার অন্য কাহারও নাই। সাধু সজ্জনের নিন্দা বা তাঁহাদের

কার্য্যের সমালোচনা ও দেব-চরিত্রের সমালোচনা একান্ত গর্হিত। সরল ভাবে আত্ম-দোষের অন্বেষণ করিবে ও সংশোধনের চেষ্টা করিবে। কপটতার আশ্রয় কখনই গ্রহণ করিবে না। সকল দোষেরই ক্ষমা আছে, অহংকার ও কাপট্যের ক্ষমা নাই।

৯৯। সকল প্রকার উন্নতিই চরিত্রের উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করে। কাহারও মনে আঘাত দিবে না। ইন্দ্রিয় জয় করিবে, কায়-মনঃ ও বাক্যে সত্য পালন করিবে। গুরুতে অচল শ্রদ্ধা রাখিবে. ধৈর্য, ক্ষমা ও করুণা বৃত্তির অনুশীলন করিবে। চিত্ত সর্ব্বদাই অনাসক্ত ও প্রশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে—এই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ প্রকৃত অধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য।

১০০। আমি ত' আছি—সদা-জাগ্রত ভাবে, তোমাদের খুবই কাছে! ঠিক, ঠিক ভাবে কর্ম্ম কর, তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে। বৃথা চিন্তা কর কেন?

১০১। আমি, আমি-কি আমি তুমি, কি জগৎ আমি তাহা আমি জানি না; তবে যাহা লিখিব বা বলিব তাহা অব্যর্থ। দিবা-রাত্রি, আলো-অন্ধকার দেব দ্বিজ না থাকিলেও না থাকিবে। সৃষ্টি লয় হইতে পারে, দেবতাদের কার্য্য ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহা ঠিক, এবং তাহাই সত্য।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব
জ্ঞানগঞ্জ, পাঞ্জাব
(শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবকে লিখিত পত্রাংশ)

১০২। এক ছাড়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু আছে ভাই! যদি থাকে, তাহাই আছে। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা। সত্য সত্য, প্রকৃতির খেলা কিনা; এ খেলার খেলা যিনি খেলাইতেছেন তিনি জানেন না—যিনি জানেন, তিনিই জানেন। জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃ, যে জ্যোতিঃ দেখিতে ইচ্ছা করিলে বা দেখিলে, বলা যায় না। জ্ঞানে ভক্তি আসিয়া ভাব হয়, তাহাই ঠিক। সকলেই 'ক্রিয়া' করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে। কেহ মরে না, কেহ বাঁচে না—মরা-বাঁচা স্থূলের খেলা। তাহাতেই বলি জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। এখন ব্রহ্ম কি ভাবিবার বিষয়, অন্য কিছু নয়। তুমি' আমি এবং জগৎ, ত'বে তুমি আমি কে ভাই ?

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব।

১০৩। শুভ-বৃত্তি প্রদর্শিত পথের অনুসরণে কামাদির দুর্জ্জয় বল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যোগী সকাম-জনিত তৃপ্তি একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং নিষ্কাম যোগ-শক্তির আকর্ষণে অনাসক্ত বৈরাগ্যের সাধন-সাহায্য বুঝিতে সক্ষম হন। যে পর্য্যন্ত সাধকত্ব-শক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত হরি-চিন্তা বা ধ্যানের গূঢ়তত্ত্ব বুঝা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার মধ্যে বিপদ-সঙ্কুল আমিত্বের বিচিত্র লালসায় পৃথিবীর ঘটনাসমূহ বুদ্বুদের ন্যায় অবিশ্রান্ত ফুটিতে থাকে। এই নিমিত্ত যোগের বিশেষ প্রয়োজন।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব। ১৮৩৫

১০৪। মঙ্গলময়ের রাজ্যে জীব কেবল অবস্থাতে কাম-ক্রোধাদির অধীন হইয়া, পাপ-পুণ্যাত্মক বিবিধ কর্ম্ম আচরণ

করে। দেহ, আত্মা হইতে বিভিন্ন; আত্মা ত' কিছুই ভোগ করেন না;—যদি করেন, পাপ-পুণ্যের ভাগী কে? * * * * *

দাদা গুরুদেব (শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস) একদিন সকল যোগীকেই তোমার অসীম যোগের বিষয় দেখাইলেন। এখনও যে উগ্র তপস্যা করিতেছ, তাহাও দেখাইলেন। ফিরে দেখি, কিছুই নাই—চকিতে অন্তর্হিত। দেহ কণ্টকিত হইল! পুনঃ দেখি জগৎ নাই, আমিও নাই। এ কি খেলা ভাই! তাই জিজ্ঞাসা করি—জীবের অতীত বয়ঃক্রম হইল, অনেক ম্লেচ্ছ, হিন্দু, মুসলমান শিষ্য করিয়াছি। অনেক দেখিলাম, অনেক করিলাম, তোমার ন্যায় যোগ-শিক্ষা পরমারাধ্য ভৃগুরাম স্বামী আমায় দিলেন না। আমার ইচ্ছা তোমার নিকট কিছুদিন থাকিয়া চাত্বর এবং যাগ-কল্প যোগ-শিক্ষা করি। ইহাতে অভিপ্রায় কি? ব্রহ্মচারী প্রায় ৯০০ শত হইতে তোমায় পরীক্ষা করিতে হইবে। এই চতুর্থ মঠের মত। তোমাকেই সকলে স্বস্তি করিয়াছেন। বোধহয় শীঘ্রই তোমাকে পাঞ্জাব আসিতে অনুমতি করিবেন।

—শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস দ্বারা
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে লিখিত পত্রাংশ
জ্ঞানগঞ্জ, পাঞ্জাব—১৮৩৪

১০৫। * * * তুমি (শ্রীবিশুদ্ধানন্দ) যে সকলকে বর্ত্তমান সময়ে শিষ্য করিয়াছ, আমি তাহাদের নিকট প্রতিদিনই যাই ও সম্যক্ দৃষ্টিরূপে প্রতি ঘরে ঘরে বেড়াই। আমি সমস্ত দেখি, তোমার দেখিবার প্রয়োজন দেখি না। তোমার শিষ্যের যে সকল কার্য্য দেখি, তাহাতে অধঃ ও ঊর্দ্ধ দুইই আছে। যে

সকল শিষ্য একবার দীক্ষা লইয়া, পুনরায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়াছে, তাহারা যেন তোমার পদস্পর্শ না করে—করিলে, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাদের পদস্পর্শের অধিকার হইলে তবে স্পর্শ করিতে পারিবে, নচেৎ দুই তিন বৎসর স্পর্শ যেন না করে।

* * * ৬৯৭ জন শিষ্যের মধ্যে ৪৩২ জন কর্ম্মী। তাহারা চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবে এবং সিদ্ধিলাভ হইবে। সৃষ্টি লয় হইতে পারে—আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য। চন্দ্র-সূর্য্য থাকিতে তাহারা আর জন্মগ্রহণ করিবে না। যদি করে, তাহা হইলে আমি জন্মাইব, ব্রহ্মা জন্মাইবে, দেবতারা জন্মাইবে, কিন্তু তাহারা জন্মাইবে না।

* * গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলে 'ক্রিয়া' নষ্ট হয়। ৺শিব-চতুর্দ্দশীতে আশ্রমে আমার দুই একটী খেলা দেখিতে পাইবে।

* * আশ্রমে যাইয়া তোমার সকল শিষ্য পরস্পরের নিকট যোনি-মুদ্রা করিয়া বসিলেই সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। ক্রমান্বয়ে দেখিবে দুঃখ ব্যতীত, এ জগতে সুখের আশা কম। ঠিক ঠিক ভাবে ক্রিয়া করিলে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবে।

* * * তোমার অনেক শিষ্য অনেক সময়ে, তোমার উপর সন্দিগ্ধ-চিত্তে থাকে, তাহারা জানে না যে গুরুর প্রতি, আৎ তোমার প্রতি, তোমার দয়ার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া, কল্পিত অনুষ্ঠানের দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া পথভ্রষ্ট পথিকের মত ক্লেশ ভোগ ভিন্ন অন্য কোন লাভই হয় না। তাহাদের অভীষ্ট লাভের ইচ্ছা ক্লীবের পুত্র-মুখ দর্শনেচ্ছার মত। * * আমাদের অনুমতি

ব্যতীত তোমার শিষ্যদের বা অন্য কাহারও বিষয়ে যোগ-ক্রিয়া বা জ্যোতিষের দ্বারা দেখিবে না। যে মুহূর্ত্তে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার এতদিনের 'ক্রিয়ার' সমস্ত ফল ধ্বংস করিব। আমি বলিতেছি—অন্য কেহ বলেন নাই। আমি কি, তাহা তুমি বিশেষ জান।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংসদেব—১৮৩১

১০৬। মহাদুঃখ ও মহাভয়ই বন্ধু! যিনি জগৎ প্রসব করিতেছেন এবং যিনি তাঁকে প্রসব করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বই সর্ব্বদা অনুসন্ধানে যিনি রত এবং করিতেছেন, মেঢ্রে চতুর্দ্দল, কণ্ঠে ষোড়শ-দল, চক্ষে দ্বিদল, মস্তিষ্কে সহস্র-দল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তিনি যোগ-বিজ্ঞানে পরম যোগী।

* * * গুরুদেবকে যদি আন্তরিক মনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় পবিত্রতার অধিকারী হয় এবং তাঁহার কৃপায় চেষ্টাশূন্য হইলেও স্বভাবতঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিণাম-ব্যাপার পূজ্যপাদ স্বয়ং গুরুদেবই জানেন ও দেখিতেছেন।

* * * যিনি বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুলধনে বঞ্চিত হইবেন, চিরকাল দুঃখভোগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * লালসা না ত্যাগ হইলে, বিশুদ্ধ আনন্দের আশা কোথায়? * * দুঃখ ব্যতীত এ জগতে সুখের আশা কম।

—শ্রীশ্রীউমানন্দ পরমহংসদেব দ্বারা লিখিত পত্রাংশ

জ্ঞানগঞ্জ, পঞ্জাব।

১০৭। যে 'ক্রিয়া' দিয়াছি, আদেশ মত ঠিক ঠিক করিলে কোন বিষয়েই অভাব ও চিন্তার কারণ থাকিবে না। বৃথা খারাপ কাজ বা খারাপ চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত না। জগতে ধর্ম্মই প্রধান জিনিষ, ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার কোন দ্রব্যের অভাব থাকে না। সর্ব্বদাই পরমানন্দ ভোগ হয়।

১০৮। জীবমাত্রই মহাশক্তির কৃপাতে আকর্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ তত্ত্ব-বস্তুর অধিকারী হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। সেই মহাশক্তি কি উপায়ে পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা যে না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে—পথভ্রষ্ট পথিকের মত তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়।

১০৯। তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিলে দুস্তর সংসার-মরুভূমি অতিক্রম করিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। যে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখে, তাহার আবার কিসের চিন্তা? ক্ষীণ বস্তু সবল হইতে বেশী সময় যায় না। আবার, সবল বস্তু ক্ষীণ হইতে বেশীক্ষণ হয় না।

১১০। জীব ভ্রান্তির আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মহাশক্তির তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। বাস্তবিক, অজ্ঞানতাই ইহার মূল কারণ।

* * * মায়ের নামই একমাত্র আশ্রয়।

১১১। প্রলোভনপূর্ণ জগতে সকলই আশ্চর্য্য। প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া, অসত্যের কতই আদর হইতেছে।

১১২। ** চিন্তা কি? আমি তোমাদের নিকট সর্ব্বদাই যাই ও দেখি!

১১৩। যাহার মন দিগ্‌যন্ত্র শলাকার ন্যায় অবিচলিত ভাবে ত্রিতাপহারিণীতে নিয়ত নিমগ্ন রহিয়াছে, শম, দম, ও তিতিক্ষাদির দ্বারা নানা চিন্তার যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, জগজ্জননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানে একটুকু বিচ্ছেদ ঘটিলে ব্যাকুল হয়, তাহারই উত্তম অবস্থা।

** বাহ্যিক জগতের ভালবাসা, ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় ও স্বাস্থ্যের অভাব, এরূপ অবস্থার উপর অনাসক্ত হওয়াতেই নিশ্চয় সকল বিষয়েই জয়লাভ হয়ই, হয়।

** বাসনার দাসত্ব হইতে যতক্ষণ মুক্ত হইতে না পারা যায়, ততক্ষণ মর্ম্মঘাতিনীর অব্যর্থ আকর্ষণে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে হয়ই এবং তাঁকে ভাবিলে বাজে ভাবনার বিড়ম্বনা দূর হইবে।

১১৪। মহামায়ার চিন্তা করাই ঠিক ও প্রসিদ্ধ। মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ! তাহা ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ। 'মা'—চিন্তারূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে, অন্তঃদৃষ্টি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়, ইন্দ্রিয়সকলের দুষ্ট বন্ধন সকল ছিন্ন হয় এবং মর্মপ্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থিসমূহ আল্‌গা হইয়া যায়,—কাজেই চিত্তের বহির্মুখ দ্রুতগতি হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে।

১১৫। উত্তম বৃত্তির প্রদর্শিত পবিত্র পথের অনুসরণে নীচ বৃত্তির বলসকল দুর্ব্বল হইয়া যায়।

১১৬। এক মহাশক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। মহাশক্তির শক্তির বিষয় যিনি বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন তিনিই সদ্‌গুরু।

১১৭। মানুষ কখনই ভগবান হইতে পারে না।

* * * এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লাগে। শুষ্ক-জ্ঞানের তীক্ষ্ণ চিন্তার উত্তাপে মহাশক্তির অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন। তাহার উপর আবার মানুষ-'ভগবান' বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে, তবে লোকে কি বুঝিবে ?

যে জ্ঞানে নিরীশ্বরবাদকে উপস্থিত করে, ঐ জ্ঞানের ভিতরই ত' অনাবৃত তত্ত্ব জ্ঞান, তাহাতেই ত' আবার মহাশক্তির স্থিতি-ভাব বুঝাইয়া দিতেছে। শুষ্কজ্ঞান, সু, কু ঘুচিয়া, সরল বিশ্বাসে বুঝিবে ঐ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, মহাশক্তি। মহাশক্তি আবার জীবভাবে আপনাতে আপনিই বিরাজ করিতেছেন।

১১৮। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত, সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। অশান্তি থাকিবে না—থাকিতে পারে না।

১১৯। মানব-হৃদয়ে যদি সর্ষপ-সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলে অখণ্ড মহামায়াকে বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তার যে জ্ঞান, উক্ত জ্ঞানের উজ্জ্বল তেজে সকল প্রকার পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা আসক্তির আবর্জ্জনা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে মহাশক্তির জগৎ-শক্তির জ্ঞানামৃত প্রকাশ হইয়া কলুষিত সন্তপ্ত-চিত্ত মহাআবরণ হইতে পরিত্রাণ পায়ই পায়।

১২০। সীমাশূন্য মহাশক্তির মহাবিজ্ঞান আলোকে প্রাণে

যে কি হয়, যাহার হইয়াছে—সেই জানে। ভাষা নাই, ভাষা থাকিলে লিখিতাম। বেশ বুঝা যায়, যোগ ও বিজ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

১২১। জগদম্বার প্রকাশ, জীবাত্মা নয় কি? জীবাত্মার প্রকাশ মন, নয় কি? সূর্য্যের কিরণ, কিরণের উত্তাপ, উক্ত উত্তাপ যেমন জড়ীয় পদার্থসকলকে স্পর্শ করে, মনের অবস্থাও তাই। চিৎ ও জড়, উভয় শক্তির সন্ধির স্থানে পড়িয়া কখন মানবীয় ভাবে ও কখন দেব-ভাবে স্থিতি করিতে থাকে।

১২২। যেমন ঘট ভেঙ্গে গেলে অখণ্ড-ব্যাপী আকাশ, তেমনই মায়া-ঘট ভেঙ্গে গেলে মাকে অনন্ত-ব্যাপী সমভাবেই দেখিবে।

১২৩। যখন এক মহাশক্তি সগুণ নিগুণ, সাকার-নিরাকার এবং সকলপ্রকারের রূপে নিত্য, তখন বিকার-নির্বিকার ইহাও মহাশক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে। সুখ-দুঃখ, হা-হুতাশ যে দিকে, বুঝিতে হইবে এক মহাশক্তি উত্তম, অধম উভয় তত্ত্বের আস্বাদন করিতেছেন। মন, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতির নেতা কে?

(ক)

১২৪। দুঃখের ধরায়, কে আনিল হায়!
এনে রেখে, আর দেখা নাহি দেয়।
কিছু না বলিল, কেন যে আনিল,
কোথা চ'লে গেল, বুঝা নাহি যায়॥

পাইবার আশে, যাই কত দেশে,
গিরি-গুহায় বনে খুঁজে না পাই।
পাইলে সন্ধান, যাব সেই স্থান,
যায় যদি প্রাণ, তাতে দুঃখ নাই॥

কত সাধু জনে, শুধাই গোপনে,
দাও ব'লে, তাঁরে পাইব কোথায়।
কোথায় ধাইব, কোথা দেখা পাব,
অস্থির করিছে অন্তর জ্বালায়॥

* * *

(খ)

পুতুল সকলে, আপনি কি খেলে,
খেলোয়াড় না থাকিলে।
তিনি যেই ভাবে, খেলাবে নাচাবে,
নাচিতে হবে সকলে॥

কারে বা জানাই, দ্বিতীয় যে নাই,
থাকিলে কি হতো এত!
বাড়ান কমান, হাসান কাঁদান,
আপনার ইচ্ছা মত॥

রতন যে পায়, কি যে তার হয়,
যে পেয়েছে, সেই জানে।
হৃদয় মাঝারে, রাখে যত্ন ক'রে,
অন্য জনে পাছে শুনে॥

* * *

(গ)

ওঁকার পিণ্ডেতে জ্ঞান, সব তত্ত্ব সংগঠন,
করিছে প্রকাশ তায় পঞ্চ তত্ত্ব দ্বার।
এ জগতে আছে যাহা, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেও তাহা,
ইড়াতে করিছে সদা অমৃত-সঞ্চার॥

পিঙ্গলা শ্বাসে উদ্ভূত, শরীর পরিরক্ষিত,
মধ্যদেশে সুষুম্না যে করিছে বিরাজ।
খগাকারে কন্দ-যোনি, ভেদ করে মুক্ত-বেণী,
আজ্ঞা-চক্রে যুক্ত-বেণী সেজেছে কি সাজ॥

হংসরূপী শক্তি-শিব, ঐখানেই লয় সব,
বন্ধ-শোক ভেদাভেদ কিছু নাহি রয়।
সদাই আনন্দময়, সদাই আনন্দ রয়,
সুকৃতি-দুষ্কৃতি কর্ম্ম সব হয় ক্ষয়॥

প্রয়োজন হ'লে পরে,　　প্রকৃতি পুরুষ করে,
সর্ব্বব্যাপী পরম-পুরুষ করে তাঁরে।
যে বুঝে প্রকৃতি তত্ত্ব,　　নিশ্চয় সে হয় মুক্ত,
নিরাকারে হয় ব্রহ্ম, প্রকৃতি সাকারে॥

❀　❀　❀

—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের রচিত
'প্রকৃতি তত্ত্ব' হইতে উদ্ধৃত

(ক)

১২৫। সুখে থাকবে যদি মন, সংসার মায়ায় ম'জ না,
না পাইবে সুখ, সদা পাবে দুঃখ, হইবে বিষম যন্ত্রণা।
আত্ম-পরিজন দেখিছ যে সকলে,
অসময় হ'লে যাবে সবাই ফেলে,
তখন ভাসবে নয়ন জলে, হায় কি হ'ল বলে,
তা'তেও তোমায় কেহ দেখবে না।
করবে স্মরণ শ্রীমধুসূদন -
স্মরণে, মরণের ভয় আর থাকিবে না।

সন—১২৭১

❀　❀　❀

(খ)

কেন মা, কি দোষে আমায় কর দোষী,
কে দোষী, আমি দোষী না তুমি দোষী;
কে আনিল ভবে, কেন বল আনিল,
জীবের বোঝা, বোঝা মাত্র, সে বোঝা সব বিফল,
বুঝতে গেলে সব যাই ভুলি, মনে বড় পায় হাসি ॥

সন—১২৭৭

* * *

(গ)

মন তুমি কত সাজ সেজে, এসে ভব-মাঝে,
কত ভাবে কত কাল কাটালে।
নাহি তোমার বোধ, বড়ই নির্ব্বোধ,
বোধ-শূন্য হ'য়ে, হায় কি করিলে !
কত পাপ-তাপে পেতেছ যন্ত্রণা,
ওরে পাজি মন, তবু (তোর) চৈতন্য হ'লো না,
একবার ভাবিলি না শেষের দিন বলে।
ভোলানাথ বলে এবার পড়ে তুমি ফেরে,
আক্কেল দিলে উন্মাদ-কুকুরে,
এখন কাঁদিলে কি হবে, ডাকরে—'দুর্গা' 'দুর্গা' ব'লে।

সন—১২৭৫

* * *

—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের রচিত
"গীত-রত্নাবলী" হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত

—পুস্তকাবলী—

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (পাঁচ খণ্ড)

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১৲

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১৲—১'২৫ পয়সা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা—

পুর্ব্বার্দ্ধ—২৲

উত্তরার্দ্ধ—২৲

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—৫০ পয়সা

৪। বিশুদ্ধবাণী—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—

প্রথম ভাগ— ২৲

দ্বিতীয় ভাগ— „

তৃতীয় ভাগ— „

চতুর্থ ভাগ— „

পঞ্চম ভাগ— „

ষষ্ঠ ভাগ— „

সপ্তম ভাগ— „

অষ্টম ভাগ— „

নবম ভাগ—২'৫০ পয়সা

দশম ভাগ—'দিব্য-কথা' (পূর্বার্দ্ধ)—৩৲

প্রাপ্তিস্থান

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম

মালদহিয়া-বারাণসী-২